ধৃতং প্রেম

ত্রিংশতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব
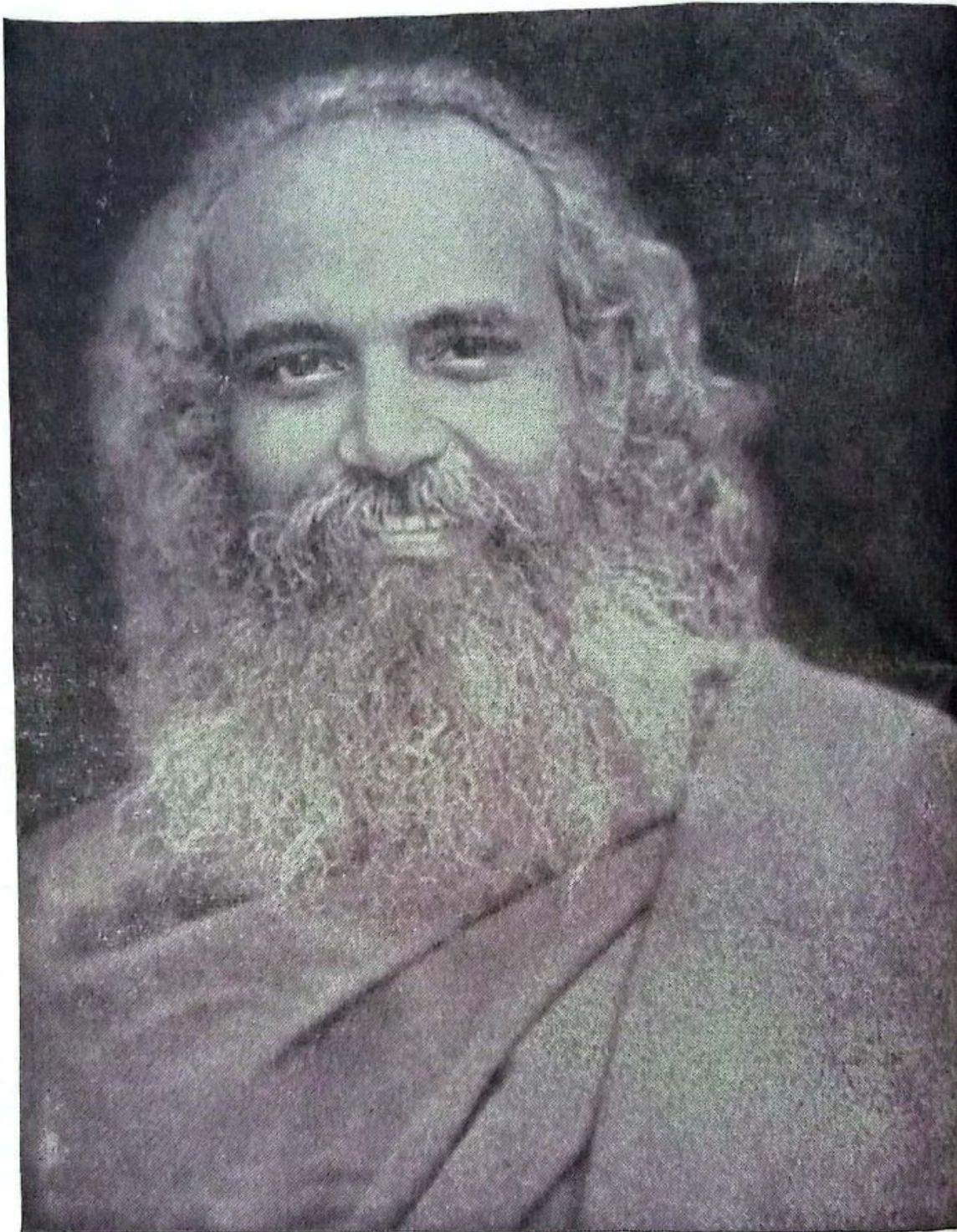
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ত্রিংশতম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৬ শ্রাবণ, ১৩৭৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, তোমাকে খুব বড় করিয়া একখানা পত্র লিখিব। কিন্তু অবসর করিতে পারি নাই। শত শত ছোট পত্র লিখিতে যাহার দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, বড় পত্র লিখিবার তাহার অবসর কোথায়? বিগত ফাল্গুন মাস হইতে সুরু করিয়া শ্রাবণের অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত আমি আট নয় হাজারের উপর পত্র লিখিয়াছি। লিখিয়াছি কাহাদিগকে? যাহারা আমার পত্রগুলি মন দিয়া পড়িবে বলিয়া আমি মনে মনে আশা করি। পত্র লেখার

এই হিড়িকে পড়িয়া কত কত পত্রলেখকের পত্র যে পড়িবারও অবকাশ পাই নাই, তাহার কি বর্ণনা আর দিব। যে কেবলই পত্র লেখে, সে কি পত্র পড়িবার অবকাশ পায়? যে কেবলই পত্র পড়িবে, তার কি পত্র লিখিবার অবকাশ হইবে? আমার অবস্থাটা চিন্তা কর মা। ভাগ্যে দুই তিনটী বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী সুদূর মফঃস্বল হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার পত্রগুলি নকল করিয়া কার্ব্বণের অনুলিপি নানা স্থানে পাঠাইবার সহায়তা করিয়াছে।

কি লিখিয়াছি?—লিখিয়াছি নানা জনকে নানা কথা। কোনও কোনও স্থলে একই কথা বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন দশ জনকে, বিভিন্ন বিশ জনকে বা বিভিন্ন ত্রিশ জনকে পাঠাইয়াছি। শ্রম করিয়াছি অফুরন্ত। কিন্তু ফলের প্রত্যাশা করিয়াছি কি? করি নাই। করি নাই, কারণ কাজ করিবারই আমি অধিকারী, ফল প্রত্যাশার ত আমি অধিকারী নহি। আর এক কারণেও করি নাই। সেই কারণটী এই যে, তোমরা ত অনেকে বৃক্ষের মতন স্থাবর ও প্রস্তরের মতন স্থবির হইয়া গিয়াছ। কথা বলিলে কয় জনে কাণে শুনিতে পায়? শুনিতে যাহারা পায়, তাহাদের কয় জনের হৃদয়ের তারে সে কথার ঝঙ্কার জাগে? স্পন্দন জাগিলেই যে সে কাজ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? ব্রহ্মচর্য্যহীন অপাত্রগুলির অন্তরে দৈববলে কোনও প্রেরণা জাগরিত হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না। তাই, বিদ্যুৎ-প্রবাহ আসিতে না আসিতে চলিয়া যায়, আলোও জ্বলে না, মেশিনও চলে না। তবু কথা কহিয়া যাইতেছি, তবু পত্র লিখিয়া যাইতেছি। জীবনে কোটি কোটি পত্র লিখিয়াছি, সবগুলিই ত বৃথা হয় নাই! ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে আরও কয়েক কোটি পত্র হয়ত লিখিয়া যাইব, যাহার অনুলিপি থাকিবে না, যাহার ফলপ্রত্যাশা করিব

না। পাখী যখন গান গায়, তখন কি অন্যে শুনিয়া লাভবান্ হইবে ভাবিয়া গাহে ? না, সে তার স্বভাবের প্রেরণায় গান গাহে। আমিও স্বভাবের প্রেরণায় কথা বলি, চিঠি লিখি, গান গাই। বলিলাম, লিখিলাম, গাহিলাম,—এই টুকুতেই আমার পূর্ণ সার্থকতা। এ কথায়, এ লিপিতে, এ গানে অপরে উঠিল, জাগিল, কাজে লাগিল ত' আমার ষোল আনা লাভের অঙ্ক আঠারো আনায়, চব্বিশ আনায়, চৌত্রিশ আনায় গিয়া পৌঁছিল।

কাহাকে কি লিখিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ নকল নাই। আংশিক অনুলিপি রক্ষিত আছে। তাহা হইতে কিছু এলোমেলো ভাবে তোমাকে লিখিয়া পাঠাইতেছি। এই আংশিক নকলগুলি তোমারই জন্য রক্ষিত ছিল। তোমাকে বড় পত্র লিখিবার সাধ আমার এই ভাবেই পূরিবে। আমার কাছ হইতে দীর্ঘ পত্র পাইবার শখ তোমার এই ভাবেই মিটিবে।

লিখিয়াছি,—তোমরা প্রত্যেকে পরস্পরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষা কর। তোমাদের পারস্পরিক পরিচয় এবং মিলন এমন এক বিমল মিত্রতার সৃষ্টি করুক, যাহা তোমাদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ এক সুমহান্ সৎপ্রয়াসের রূপ ধরিয়া জগৎ-সমক্ষে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত হইয়া দুর্ব্বার এক মহাশক্তিতে পরিণত হউক, যাহা জগৎ হইতে অনেক অন্যায়, অনেক অশান্তি, অনেক পাপ ও অনেক দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তোমাদের সকলের ঐক্য সৎপ্রয়াসীর হৃদয়ে আহ্লাদ এবং অসৎ-প্রয়াসীর অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করুক। সাত্ত্বিকী শুভশক্তির অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়া তোমরা জগতে এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হও। ইহা সম্ভব হইবে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক-

প্রেম গভীর হইলে এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসীর প্রতি তোমাদের প্রেম অকপট হইলে।

আমি লিখিয়াছি,—মানুষমাত্রেরই প্রতি তোমাদের থাকিবে শান্তিপূর্ণ মৈত্রীভাব, প্রীতিপূর্ণ বন্ধুভাব, আপদে বিপদে সহায়তাকারী আত্মীয়ের ভাব। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় হিসাবে ভিন্নতা আছে বলিয়াই কাহাকেও তুমি পর বা শত্রু ভাবিবে না, তাহার উপকারার্থে যখন যে ভাবে যতটুকু সেবা-দান তোমার পক্ষে সম্ভব, তাহা তুমি কুণ্ঠাহীন, দ্বেষহীন, ঈর্ষ্যাহীন মনে দিবে। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও যে, যাহারা তোমার গুরুভাই বা গুরুভগিনী, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিশ্চয়ই অগ্রাধিকার পাইবে। নিজ ভাই-এর, নিজ বোনের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যাহারা কুণ্ঠিত, দূরের লোককে ভাই আর বহিন্ ডাকিয়াই কি তাহারা সত্যিকারের সম্প্রীতির অনুশীলন করিতে পারে? মানুষ মাত্রেরই প্রতি সৎ ও সততা-পরায়ণ হইবে, আর্থিক বা নৈতিক ব্যাপারে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিবে না। কিন্তু মানুষমাত্রেরই সহিত যাহাতে এইরূপ ব্যবহারে তুমি সিদ্ধকাম হইতে পার, তাহারই জন্য তোমার গুরুভাই গুরুভগিনীদের সঙ্গে আর্থিক ও নৈতিক প্রতিটী ব্যাপারে তোমাদের সৎ থাকিতে হইবে। চারিদিকেই লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি যে, অপরিচিত ব্যক্তিদের সহিত গুরুভাই-গুরুভগিনী রূপে পরিচিত হইবার পরে একদল লোক ইহাদিগকে নানা ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়া বিষাক্ত এক অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। ইহার চাইতে সর্ব্বনাশকর মারাত্মক ব্যাপার আর কিছুই নাই। তোমরা যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান-বোধ রাখিয়া চলিতে পার, তোমরা যদি একের আচরণের দ্বারা অপরের মনে দেবভাব

উদ্রিক্ত করিতে পার, তোমরা যদি সৎস্বভাব হও, সদাচারী হও, সদ্রুচি-সম্পন্ন হও এবং একান্ত ভাবে একনিষ্ঠ ও একমুখ হইয়া আদর্শের সেবায় যদি আত্মনিয়োগ কর, তাহা হইলে এজগতে তোমরা অনেক অকল্পনীয় অসাধ্যকে সাধন করিতে পারিবে। যাহা তোমরা অনায়াসেই করিতে পার, তাহা কেন করিবে না ? সংখ্যায় অধিক বলিয়াই নহে, চরিত্রে দৃঢ় বলিয়াই যে তোমরা সকলে মিলিলে সত্য সত্য স্মরণীয় কীর্ত্তি কিছু রাখিতে পারিবে, এই বিশ্বাস হইতে কদাচ স্খলিত হইও না।

লিখিয়াছি,—অনেকে একা একা দশের, দেশের, সমাজের বিশ্বের সেবা করে। একা করে বলিয়াই সে কাজে বিস্তার কম, অনেক সময়ে গভীরতাও কম হইয়া থাকে। বহুজনে একত্র হইয়া দশের, দেশের, সমাজের কাজে ব্রতী হইলে ব্যাপক সেবা এবং গভীর সেবা দ্বিবিধ সেবাই জগৎকে দিতে পারে। এজন্য চাই পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা, সুজনতা ও প্রীতিপরায়ণতা। প্রীতিহীন অসহিষ্ণু দুর্জ্জনেরা একত্র মিলিলে হয়ত পরানিষ্ট-কার্য্য চূড়ান্ত পর্য্যায়ে চালাইতে পারিবে কিন্তু পরোপকারকার্য্যে নামিয়া নানা ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতালিপ্সার ছলনায় ভুলিয়া আত্মঘাতে বা আত্মীয়-হননে প্রবৃত্ত হইবে। তোমরা প্রত্যেকেই দেশ ও সমাজের কুশল-কল্পে অল্প-বিস্তর কাজ করিতে পার,—শুধু ইচ্ছাটুকু থাকিলেই হইল। এই ইচ্ছাটুকুকে তোমরা সৎকার্য্যে প্রয়োগ কর। আমি চাহি, তোমাদের সকলের হাত আমার সেই ক্ষুদ্র কাজগুলিতে লাগুক, যেগুলি আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি করি না, যেগুলি আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য করি না, যেগুলি আমি আমার আত্মীয়-পরিজন বা সাংসারিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তির মঙ্গলার্থে করি না, যেগুলি আমি সর্ব্বকালের সর্ব্বজীবের শুভ-

সম্পাদনের জন্য করি। সকলের হাত লাগিলে অতীব ক্ষুদ্র কাজেও ফলও কল্পনাতীত বৃহৎ হয়। আমি জীবন ভরিয়া কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজই করিয়াছি কিন্তু তাহার সাকুল্য পরিণতি ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র না ভাবিয়া প্রতি জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্যাণ-কর্ম্মে এমন ভাবে যূথবদ্ধ হইয়া কর-সংযোগ কর, যেন ঐ ক্ষুদ্র কাজটাই একটা বিরাট মহোৎসবে পরিণত হইয়া যায়। কি নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যে আমি তোমাদের কত জনকে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কিন্তু তোমরা কি জান যে, এক একটা পত্রের বিশ, পঁচিশ, ত্রিশখানা করিয়া কার্ব্বণ-কপি তৈরী করিবার সময়ে আমার ক্ষুদ্র-পরিসর কর্ম্মস্থানে বা ততোধিক ক্ষুদ্র-পরিসর রেলের কামরায় কর্ম্মের কি নিদারুণ মহোৎসব সুরু হইয়া গিয়াছে?

লিখিয়াছি,—যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। তোমার গুরুভাই হইয়াও যাহারা কাজ হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাদের এই একাচোরা ভাবের জন্য নিন্দা করিয়া বিরক্ত করিও না, তাহাদের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম প্রেম প্রসারিত করিয়া দিয়া প্রীতিপূর্ণ ভাষণে তাহাদিগকে সৎকর্ম্মের প্রতি বারংবার আহ্বান কর। যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক নহে, চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ কর। যে আজ উদাসীন, দশজনকে কর্ম্মরত হইতে দেখিলে সেও কাল আগ্রহ করিয়া কাজে হাত লাগাইবে। এই পরম সত্যে বিশ্বাস করিয়া কাজ ধর এবং যাহা একবার ধরিলে, তাহা আর ছাড়িবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। আমি তোমাদের প্রতিজনকে কর্ম্মরত, নিষ্ঠাবান এবং আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেখিতে চাহি। চারিদিকে অবিশ্বাসীরা অট্টহাস্য হাসিতেছে। তোমাদের

নিষ্ঠা এবং ঐক্য দিয়া তাহাদের প্রগল্‌ভতা স্তব্ধ করিয়া দাও। জগতে তোমরা কাজ করিবার জন্যই আসিয়াছ, হেলায় হেলায় দিন কাটাইবার জন্যও নহে, হাসি-ঠাট্টায় নিজেদিগকে বিকাইয়া দিবার জন্যও নহে, ইতর সুখে মজিয়া থাকিয়া পশুর অধম হইবার জন্যও নহে, বিরুদ্ধবাদীর আলোচনার ভয়ে বা অপভাষী কুচক্রীর বক্রদৃষ্টির আতঙ্কে কাঁপিয়া মরিবার বা কাঁদিয়া মরিবার জন্যও নহে।

লিখিয়াছি,—কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিশ্ববাসীর জন্য প্রতে কে কিছু না কিছু করিয়া উঠিতে পারে। ইচ্ছাটা ঠিক ঠিক হওয়া চাই অপর কর্ম্মীর গৌরবান্বিত জীবনের দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাইতে শিখিলে কর্ম্মে রুচি আসে, প্রবৃত্তি আসে, আগ্রহ আসে। একা একা কাজ করার চাইতে সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করার সুবিধা বেশী কারণ, তখন অতি ক্ষুদ্র-শক্তি ব্যক্তিরও কাজটুকু কাজে লাগে। বহু দুর্ব্বল ব্যক্তিও একত্র মিলিত হইলে তাহারা মহাবল ধারণ করিয়া থাকে। এই দুর্ব্বল ব্যক্তিরা যদি সত্যশীল, চরিত্রবান্ ও আদর্শপরায়ণ হয়, তাহা হইলে কোটি বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের অস্ত্রধারী শস্ত্রপাণি সৈন্যগণও ইহাদের রুখিয়া রাখিতে পারে না। স্বভাবত যাহারা দুর্ব্বল, ঐক্যবদ্ধ হইলে তাহারাও বলসাধ্য কর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে। দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্তদের ঐক্য আপাততঃ লোক-ভয়ঙ্কর হইলেও ইহাদের ঐক্য পরস্পরকে বিনাশের ভূমিকাই রচনা করে, পরন্তু সৎস্বভাব আদর্শবাদী পরিশ্রমী লোকদের ঐক্য দীর্ঘকাল টিকে এবং সকলের সন্ত্রাস নিবারণ করে। আমি চাহি, তোমরা প্রত্যেকে সৎ হও, পবিত্র হও, শুচি হও, শুদ্ধ হও, নিঃস্বার্থ হও, সেবাপরায়ণ হও, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত মিলিত হও এবং মহাবলের মূল উৎসকে উদ্‌ঘাটিত কর। তোমাদের

কাজ তুচ্ছ কিন্তু বিচিত্র এবং অনেক। সকলে মিলিয়া কাজ শেষ করিতে হইবে। সুতরাং সকলকে কাজের মধ্যে ডাকিয়া আন।

লিখিয়াছি,—তোমাদের হাতে কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, এই কথাটী তোমরা বিশ্বাস কর। কি কাজে কে কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিবে তাহা দ্রুত নির্দ্ধারণ কর। নেতৃস্থানীয়দের সহিত যোগাযোগ করিয়া তোমার কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় অবিলম্বে ব্যক্ত কর, যেন তাহারা তোমার অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার কারণ-স্বরূপ না হয়। সকলের জন্য যেটুকু খাটিবে, সেইটুকুই তোমার সাত্ত্বিক জীবন। নিজের জন্য ত সবাই খাটে, তাতে শুধু ব্যক্তিগত জীবনই গড়িয়া ওঠে। কিন্তু তোমার ভিতরে একটী বিশ্বমানব লুকাইয়া আছে। বিশ্বের জন্য খাটিবে, তবে ত সেই বিশ্বমানবটী স্বরূপ-মূরতিতে আত্মপ্রকাশ করিবে। স্থানীয় গুরুভাই ও গুরুভগিনীদের মধ্যে যাঁহারা নেতৃত্ব-গুণ-সম্পন্ন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য কর। তাঁহাদের মধ্যে অবহেলা, গড়িমসি বা গতির শ্লথতা দেখিলে, তোমরাই কাজ শুরু করিয়া দাও এবং নেতারা, আগাইয়া আসিলে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ কর। মোট কথা এই যে, বসিয়া কেহ থাকিতে পারিবে না। এমন এক একটা সময় আসে, যখন কাহারও বসিয়া থাকা উচিত নহে। বর্ত্তমান সময়কে তদ্রূপ মনে করিও। সকলের শুভার্থে বর্ত্তমানে তোমাদের প্রত্যেককে কাজ করিতে হইবে। আলস্য, উদাসীনতা, দ্বিধা বা দুর্ব্বলতা এখন আর চলিবে না। কাজ সামান্য কিন্তু সকলে মিলিত হইয়া করিলে তাহার ফল অসামান্য হইবে। কোন্‌খানে কোন্ গুরুভাই গুরুবোন্ মুখ বুজিয়া লুকাইয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর এবং প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু কাজ করিতে বাধ্য কর। সকলের সামূহিক মঙ্গলের জন্য কেহই কিছু করিবে না অথচ

সাজিয়া গুজিয়া গুরুভাই-ভগিনী হইয়া বড় পিড়ীতে বসিয়া থাকিবে, ইহা কখনও অনুমোদন করা যায় না।

লিখিয়াছি,—নিদারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ আইঢাই করিতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক ঘটি করিয়া জল উদরস্থ করিতেছি আশ্রমের কুকুর-বিড়ালগুলি দারুণ গ্রীষ্মের তাপে মরিতে সুরু করিয়াছে। গরু-মহিষ-গুলির বোধ হয় দুই একটা গতায়ু হইবে। এমন শারীরিক উদ্বেগের মধ্যেও তোমাদিগকে পত্র লিখিতে বিরত হইতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি বলিতে পার? তোমাদের সকলের সেবা যুগপৎ সকলে চাহিতেছে। এক সঙ্গে সকলকে কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিতে হইবে। কেহ পিছনে পড়িয়া থাকিবে না, কেহ দূরে সরিয়া যাইবে না, কাহারও গা বাঁচাইয়া জামায় ফুঁ দিয়া চলিবার রুচি হইবে না,—এমনটি চাই। নিজেকে কেহই তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, অন্য সহকর্ম্মীদের যোগ্যতা সম্পর্কেও কেহ অপবাদ প্রচার করিও না। প্রত্যেকেই কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিবে, যদি সকলের মধ্যে ঐক্য আনিতে পার। গুরুর নাম করিয়া প্রত্যেকে শপথ কর যে, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া হইলেও তোমরা নিশ্চিত ঐক্যবদ্ধ হইবে, ভেদবিসম্বাদকে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না এবং অবিলম্বে আশু-করণীয় কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণায় বসিয়া যাইবে যে, দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনায় তোমাদের কাজ কি ভাবে চালাইবে। আমার শিষ্যত্ব গ্রহণের মানেই হইতেছে জগৎকল্যাণের সঙ্কল্প গ্রহণ। দীক্ষার দিন এই সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করিয়াছ। এখন তোমাকে সেই সঙ্কল্প-অনুযায়ী কাজে নামিতে হইবে। সঙ্কল্প নিব কিন্তু কাজ করিব না, ইহা উপহাসাস্পদ ব্যাপার। কাজ তোমার ঘরের পাশেই রহিয়াছে, কাজ তোমার পাড়ার মধ্যেই আছে।

লিখিয়াছি,—আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছি। আমি আমরণ পরানিষ্ট হইতে বিরত থাকিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। আমি যথাসাধ্য স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া জনসেবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে আমার নিজের অশেষ কল্যাণ হইয়াছে। তোমরাও যদি প্রতিজনে এই পথই অবলম্বন কর, তোমাদেরও অশেষ কল্যাণ হইবে। সে কল্যাণ কেবল তোমাদের কল্যাণই থাকিবে না, তাহা বিশ্বের কল্যাণে রূপ নিবে।

লিখিয়াছি,—বহুজনের মধ্যে যখন কর্ম্মের কলরোল পড়িয়া যায়, তখন জানিতে হইবে যে, তোমাদের এক মহা-মহোৎসব লাগিয়া গেল। ইহার যে কি আনন্দ, তাহা নিজেরা কাজে না লাগিলে কেহ বুঝিবে না। ছোট বড় সকল কাজেই তোমাদিগকে ডাকা আমার স্বভাব। কিন্তু এক ডাকে কাজে নামিয়া পড়ার স্বভাবটী তোমাদের মধ্যে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। ছোট বড় সকলকে ডাকিয়া একত্র কর। একমন একপ্রাণ হইয়া সকলে এক উদ্দেশ্যে কাজ কর। ছোট এবং বড় সকলের শক্তি একত্র মিলিত এবং এক লক্ষ্যে সমুদ্যত হউক। তোমাদের যে শক্তি কত, তাহার পরিচয় তোমরা এই ভাবেই পাইবে। পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং দ্বন্দ্বহীন ঐক্য যেখানে আছে, সেখানে অসাধ্য বলিয়া কোনও ব্যাপার নাই। তোমরা নিশ্চিতই সকল অসাধ্যকে সুসাধ্য করিতে সমর্থ। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ছোট বা বড় বলিয়া কিছু নাই। কাজে যে হাত ছোঁয়ায়, সে-ই বড়। কাজ হইতে যে হাত সরাইয়া রাখে, সে-ই ছোট। আমার কাজে বালক-বৃদ্ধ পুরুষ-নারী সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও এবং অকপট সাধনার ফল-স্বরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও যে, তোমাদের সাধনার ন্যায় এমন নির্ম্মল, উদার এবং সর্ব্বজন-শুভদ সাধন-পন্থা আর নাই। তোমরা নিজেরা যাহা অন্তরের

যারা উপলব্ধি করিতে পারিবে, একমাত্র তাহাই অপরকে দিতে সমর্থ হইবে। সমস্ত বিশ্বকে প্রেমময় কর, সাধনময় কর, মধুময় কর।

লিখিয়াছি,—সংসারকে নামের মধুতে মাখিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা তোমাদের জীবনের মহত্তম কর্ত্তব্য। ভগবানের নামে শান্তি আসে। তোমাদের জীবনে শান্তি দেখিলে চারিদিকে শত শত জীবনে শান্তির স্ফুরণ ঘটিবে। তোমরা নিজেরা শান্তিময় হইয়া সমগ্র জগৎকে শান্তিময় কর।

সর্ব্বশেষ পত্রখানাতে লিখিয়াছি,—তোমাদের প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে, আমি তোমাদের স্বার্থেই কাজ করিতেছি, আমার শ্রম আমার নিজের জন্য নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

গুরুধাম,
কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৫৪
১৪ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৭৯
(৩১ আগষ্ট, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ইংরাজি ৬৮ সালের ৬ জানুয়ারী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারি বৎসর পূর্ব্বে তুমি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলে, তাহার উত্তর আজ দিতেছি। এতদিন পড়িবারও অবসর পাই নাই, জবাব দেওয়া ত দূরের কথা। প্রত্যেকের

পত্রই আমি যত্ন করিয়া রাখি পড়িবার জন্য এবং সম্ভব হইলে জবাবও দেই।

তোমার পত্রে তুমি দেশ ও সমাজের স্বার্থে অনেকগুলি শুভাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ। লক্ষ্য করিয়া দেখিও, আমি পত্রের উত্তর দিতে না পারিলেও তোমাদের কয়েক জনের সাত্ত্বিক শুভাভিলাষ এই সাড়ে চারি বৎসরে আস্তে আস্তে প্রত্যাশাতীত ভাবে পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। সত্যের জয় সর্ব্বদা এই ভাবেই হয়। সত্য নিজের বলে যত দ্রুত চলে, অসত্য, ভাণ, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নানা কৃত্রিম বিদ্যুতের শত সহায়তাতেও তদ্রূপ চলিতে পারে না। তোমরা ইহার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও যে, তোমাদের কোনও প্রচারণায় কণা-মাত্র মিথ্যা, অতিরঞ্জন, লোক ভুলাইবার জন্য চতুরতা বা মানুষকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকৃষ্ট করিবার জন্য ভীতি বা প্রলোভনের জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন হইবে না। সত্যের পথ বড় সহজ পথ, বড় সরল পথ, কৃত্রিমতা বা হিসাবী বুদ্ধির সেখানে কোনও স্থান নাই।

আদর্শের পতাকা সবলে ও দৃঢ়তার সহিত ধরিবে এবং উচ্চে তুলিয়া ধরিবে। নিজেদের আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস বা অনাস্থা থাকিলে সবলে ধরিতে পারিবে না। নিজ নিজ জীবনে আংশিক হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের চর্চ্চা না থাকিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। নেতৃস্থানীয় এবং একেবারে সাধারণ স্তরের সকল কর্ম্মীকেই এই সত্যটী বিশ্বাস করিতে হইবে, এই সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কেহ চেষ্টা করিয়াও সফল হয় নাই, ইহা দোষাবহ নহে কিন্তু কেহ চেষ্টাই করে নাই, দোষটা রহিয়াছে এইখানে। তোমরা প্রতি জনে প্রতি জনকে সম্যক্ বা আংশিক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের দিকে প্রেরণা দিয়া চল। ভেড়ার পালের

মতন দলে দলে হুজুগে আকৃষ্ট লোকেরা দীক্ষার ঘরে কেবল প্রবেশই করিতে থাকিল কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পালনের, সত্য-রক্ষণের, সজ্জীবন-যাপনের, পরহিত-সাধনের কোনও প্রেরণা নিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল না, ইহা এক মারাত্মক মহামারীর লক্ষণ। শিষ্যসংখ্যা-বর্দ্ধন করিতে চাহি না তথাপি দলে দলে লোক আসিয়া দীক্ষা নিতেছে, ইহা আহ্লাদের কথা নহে, মারাত্মক আতঙ্কের কথা। দীক্ষা নিবার পরে কেহ যদি তদুচিত কাজ কিছু না করিল, তবে ত তাজা মন্ত্রও ইহাদের পক্ষে বস্তাপচা কুপথ্য অমেধ্যে পরিণত হইবে। তোমরা জনে জনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর এবং প্রতি জনকে তাহা পালন করিবার জন্য আগ্রহী করিয়া তোল।

তুমি ও তোমার দাদা যে ভাবে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চারিদিকে আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাইতেছ, তাহা আমার অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছে। আড়ম্বরহীন স্বাভাবিক প্রয়াসের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে চারিদিকে আদর্শের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া যাও। একটা বজ্র-বিদারণ ঘটাইয়া পাথরের গায়ে ফাটল ধরাইয়া তারপরে কাজ করার চেয়ে একই স্থানে ছোট্ট একটী শক্ত হাতুড়ী দিয়া পেরেকের গায়ে অবিরাম অবিশ্রাম ঠুকিতে থাকিলে অধিকাংশ সময়ে কাজের কাজ অনেক বেশী হয়। লাগিয়া থাকার মহিমাতে তোমরা অধিকতর বিশ্বাসী হও, হুজুগ করিবার বিলাসকে যতটা পার বর্জ্জন কর।

প্রত্যেকে মঙ্গলময় নামে নির্ভরশীল হও। নামের গুণে প্রতিজনের মন নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর এবং হৃদয় প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৪ ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য আমার ব্যস্ততার অন্ত-অবধি নাই। গুরুধামের পাঁচতালার হল-ঘরে একটার পর একটা দীক্ষাধিবেশন বসিতেছে আর কত লোক যে দীক্ষা নিয়া যাইতেছে, কি লিখিব। দেখিলাম, সহর কলিকাতার চেয়েও সুদূর পল্লীগ্রামের লোকদের আগ্রহ, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ব্যগ্রতা বেশী। সম্মুখের রাস্তা দীক্ষার্থী-জনতায় জাম হইয়া গিয়াছে এবং এক এক অধিবেশন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নীচতলা হইতে দীক্ষার্থীদের আনিয়া হল-ঘরে বসান হইতেছে। ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া আসিতেছি এবং তোমাদিগকে পত্র লিখিতেছি। এই পত্র জরুরী, তাই না লিখিলেও চলে না।

আচ্ছা বাবা, তোমরা নিজ নিজ স্থানের কৃত সৎকর্ম্মগুলির রিপোর্ট "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের জন্য পাঠাও কিন্তু তাহাতে অতিরঞ্জন থাকা যে দূষ্য, এই কথাটা তোমাদের মনে থাকে না কেন? মানুষকে অতিরঞ্জিত সংবাদ শুনাইয়া কদাচ উদ্দীপিত করিতে পারা যায় না। প্রকৃত কাজ, যত অল্পই হউক, মানুষকে প্রেরণা দেয়। তোমাদের অঞ্চলের নহে, অনেক দূরবর্ত্তী অন্য এক অঞ্চলের অতিরঞ্জিত সংবাদ "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইবার পরে স্থানীয় সজ্জনদের নিকটে সেখানকার মণ্ডলী একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাইলাম। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, কাছাড় জেলার শিলচর করিমগঞ্জ আদি সহর কদাচ কোনও

অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রেরণ করে না। ইহারা যতটা কাজ করে, তাহারও সম্পূর্ণ সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হয় না। তোমরা প্রতিস্থানে ইহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

কাজ করা চাই প্রাণ জ্বালাইয়া। কেহ তোমাদিগকে প্রশংসার জয়মাল্যে বা স্তুতির শেফালি-বর্ষায় অভিনন্দিত করিল না বলিয়া আফশোষ রাখিও না। এ আফশোষ নিতান্ত কর্ম্মচোর আত্ম-প্রবঞ্চকদেরই সাজে। কাজ করা দিয়া কথা। কাজের যশঃকীর্ত্তন কেহ করিল না বলিয়া ক্ষুব্ধ হওয়া মারাত্মক ভুল। যশের লোভ একবার আসিলে জীবনে আর যশঃসম্ভাবনাহীন সৎকর্ম্ম করিতে রুচি আসে না। দূর ছাই, কেহ আমাদের গ্রাহ্যই করিল না, তবে আর কাজ করিয়া কি হইবে,—এই জাতীয় অসাত্ত্বিক দুর্ব্বলতা তখন নিজের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সকল কুশল-প্রয়াসের উপরে নির্ম্মম ভাবে কামান দাগায়। তোমরা এই সব দুর্ব্বলতার আশ্রয় লইও না। দুর্ব্বলতা পাপ। এই সব পাপের সহিত তোমরা শরিকী কারবার করিও না।

এক স্থানের উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রচারের দ্বারা অন্য দশটী স্থানে অনুরূপ কর্ম্মোত্তম সৃষ্টি হইবে, এই আকাঙ্ক্ষাতেই সংবাদ-প্রচার সার্থক। তোমরা খুব একটা বাহাদুরী করিয়া ফেলিয়াছ, তাহাকে তারিফ না দিলে চলে না, এই ভাব হইতে সংবাদ-প্রচারের কোনও সাত্ত্বিক সার্থকতা নাই। তোমরা ভাল কাজ করিয়াছ, শুনিয়া অপরে ভাল কাজ করিতে প্রবুদ্ধ হউক, ইহাই তোমাদের সংবাদটীকে ছাপার হরফে বাহির হইতে দিবার অনুকূলে সব চেয়ে বড় যুক্তি।

আত্মপ্রচার বড় কথা নহে, সৎ কর্ম্মের প্রসারই বড় কথা। তোমাদের মন আত্মপ্রচারে বিমুখ হউক, তোমাদের আগ্রহ সৎকর্ম্মের সুবিপুল প্রসারের চেষ্টায় ধাবিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২০ ভাদ্র, বুধবার, ১৩৭৯
(৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। গণিকার স্বভাব লইয়া কুলবধূরা গৃহস্থের গৃহে বাস করিবে, ইহা সহনীয় নহে। কিন্তু কুলবধূর স্বভাব নিয়া চলিতে চাহিয়াও কত জনে কুলে থাকিতে পারে নাই; তাহাদিগকে কুলটা হইতে হইয়াছে। ইহার জন্য কেবল তাহারাই দায়ী নহে। সম্ভবতঃ তাহাদেরই অভিশাপে আজ কুলবধূর পুণ্যতনুগুলি গণিকার মত বহুগামিনী হইতে লজ্জা বোধ করিতেছে না।

আমরা যখন তরুণ বয়সে সমাজের সেবায় নামিয়াছিলাম, তখন এইরূপ অপদৃষ্টান্ত ছিল না, তাহা নহে। তবে উহা বড় বিরল ছিল। মনে পাপ-বাসনা জাগিলেই কেহ পাপ-ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না, অন্তরের সঙ্কোচ, লজ্জাশীলতা এবং নিন্দাভয় তাহাকে যক্ষের মতন রক্ষা করে। আধুনিক জীবন-যাত্রায় ক্রমশ লোকের প্রায় সর্ব্ববিষয়েই সঙ্কোচ

কাটিয়া যাইতেছে। লজ্জা নামক বস্তুটী বাতাসে মিশিবার চেষ্টা পাইতেছে। নিন্দার পরোয়া কয় জনে করে? ফলে যে-কোনও কাজ যে-কোনও আচরণ দুই, চারি, পাঁচ জনে করিতেছে জানিতে পারিলেই, নিতান্ত নিন্দনীয় ও জঘন্য কাজেও অগ্রসর হইতে মনের দিক্ দিয়া আর কাহারও বড় একটী বাঁধে না। দেহের দিক্ দিয়া বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য প্রয়োজন শুধু অন্য কাহারও একটু অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, দুঃসাহস বা বলপ্রয়োগ। অন্যে আসিয়া বলাৎকার করিলে অবলা নারী কি আর করিতে পারে, এই যুক্তিই তখন রক্ষাকবচ। একবার কাহারও করতলগতা হইলে তাহার আক্রমণকে রুখিবার সাধ্য কোন্ রমণীর হয় আর তাহার অভিপ্রায়কে অপূরণ করিবার সদ্‌যুক্তিই বা কি থাকে? একজনে আসিয়া পবিত্রতা লঙ্ঘন করিয়া গিয়া থাকিলে অনুরূপ বা তত্তুলনায় শ্রেষ্ঠ আর একজন আসিয়া তাহাই করিতে উদ্যত হইলে তখন তাহাকে দুরন্ত বাধা বা প্রাণান্ত প্রতিরোধ করিয়া যাইবার মধ্যে সার্থকতা কি থাকে? নারী তখন একটা বিষ্ঠার হাঁড়ি মাত্র, যে যখন যেমন সুবিধা, ইহাতে আসিয়া মলত্যাগ করিয়া যাইবে। তবে, কাজটা একেবারে প্রকাশ্যে হইবে না, হইবে আংশিক গোপনতার আড়ালে। সত্যই ত, মলমূত্র ত্যাগ করিবার কালে কে গিয়া চৌরঙ্গীর জনাকীর্ণ মোড়ে দাঁড়ায়? একটু আড়াল, একটু আবডাল, একটু নিরালা স্থান হইলেই একাজটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

তুমি তোমার নিজ পরিজনদের মধ্যে এই পাপের প্রশ্রয় দেখিতে পাইয়া হঠাৎ চমকিত হইয়াছ। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাকালে অর্জ্জুন কুলস্ত্রীরা দূষিতা হইবে ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-বিভীষিকায় পীড়িত হইয়াছিলেন। পর পর দুইটা বিশ্বযুদ্ধের কবলে

পড়িয়া ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষ ইংরাজি চাতুরীর অপকৌশলে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া প্রায় স্বেচ্ছায় নিজেদের নৈতিক মানদণ্ড এবং শুচিতার আদর্শকে নীচু করিয়া ফেলিয়াছে। তারপরে আসিয়াছে বিদেশ হইতে আরও নানারূপ নবনব মতবাদের তরঙ্গমালা, যাহার ধাক্কায় পড়িয়া মানুষের সুস্থ বিবেক দিশাহারা ও অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আগে মানুষ যে পাপ করিত জীবিকার জন্য, আজ মানুষ সে পাপ করে ফ্যাসানের খাতিরে। ইহার প্রতীকার কোথায় খুঁজিবে, কাহার কাছে পাইবে? তোমার পুত্রবধূ তাহার স্বামীকে জানাইয়া ব্যভিচার করিতেছে, তোমার পুত্র তাহার পত্নীর শোচনীয় অধোগতি দেখিয়াও বন্ধুবাৎসল্যে অবিচলিত, একথা ভাবিতেও যে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। একথা বিশ্বাস করিতে অপ্রবৃত্তি হয়। কিন্তু কালধর্ম্মে, তাহাই আজ নানা স্থানে প্রচুর ঘটিতেছে, একদা যাহা ঘটিত নিতান্ত কদাচিৎ বা একান্তই বিরল ভাবে।

দুঃখ করিও না বাবা। পুত্রকে হিতোপদেশ দিতে গিয়া গলাধাক্কা খাইয়া তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া রাস্তায় নামিতে হইয়াছে,— বেশ হইয়াছে। পুত্রের ঐ অপবিত্র গৃহ-প্রাঙ্গণে আর গিয়া তুমি দাঁড়াইও না। ভগবানকে একমাত্র সত্য এবং অনন্য-আশ্রয় জানিয়া তাঁহার নামকে সম্বল করিয়া জীবনের বাকী পথটুকু চলিতে থাক এবং বিপরীত-বুদ্ধি নির্ব্বোধ পুত্রকে ক্ষমা করিয়া কেবল আশীর্ব্বাদ কর যে, তাহার যেন আত্মসম্মানজ্ঞান ফিরিয়া আসে।

স্বামীর যেখানে আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব থাকে, সেখানে তাহার স্ত্রী সহজে স্বৈরিণী হইতে সমর্থা হয়। স্বামীর যেখানে পবিত্রতা-বোধের আত্যন্তিক অভাব, পত্নী সেখানে পবিত্র থাকিবার চেষ্টায় বিমুখ হইতে

পারে। স্বামী যেখানে এত বন্ধুবৎসল যে, স্ত্রীর মর্য্যাদা বা সম্মানের দিকে তাকাইবার তাহার অবকাশ ঘটে না, সেখানে স্ত্রীর বিপদ পদে পদে। স্বামী যেখানে অসঙ্গত কার্য্যে অর্থব্যয়ে রত এবং দুশ্চরিত্র বন্ধুবান্ধবেরা যেখানে মুক্তহস্তে আর্থিক সহায়তা করিতে অগ্রণী, সেই সকল স্থলে ইচ্ছা থাকিলেও স্বামী তাহার স্ত্রীকে নিজ মর্য্যাদায় দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না। স্ত্রীরাই প্রধানতঃ বিপথে পদক্ষেপ করে, এমন কথা সত্য নহে। স্বামীরাই অনেক সময়ে তাহাদের বিপথে পাদচারণার প্রথম সুযোগগুলি সৃষ্টি করিয়া দেয়। এই কথা বুঝিয়া তুমি তোমার পুত্রবধূকেও মনে-প্রাণে ক্ষমা কর। শাসন করিয়া ইহাদিগকে যখন অনায়াসে সৎপথে রাখা চলিত, সেই সময়ে তোমার নয়ন ছিল নিমীলিত। আজ তুমি জীবিকাহীন, পুত্র-পিণ্ড-প্রত্যাশী, পরোপজীবী। আজ তোমার শাসন কে মান্য করিবে?

পুত্রের গৃহ হইতে অপমান লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। নিষ্ক্রান্ত যে হইয়াছ, খুব ভাল করিয়াছ কিন্তু অপমানটুকুই নিতান্ত বেমানান হইল। পুত্রের গৃহ হইতে সসম্মানে যদি চলিয়া আসিতে পারিতে, তাহা হইলে আর আফশোষের কিছুই থাকিত না। তবু বলি যাহা হইবার, হইয়াছে। ঐ বিষয় নিয়া আর দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করিও না। এখন পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে এই বিপথগামিনী পুত্রবধূকে এবং বুদ্ধিবিভ্রান্ত পুত্রকে কেবল আশীর্ব্বাদ কর। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে যদি আশীর্ব্বাদ কর, তবে তাহা সফল হইবে। নামের শক্তি অমোঘ। নাম করিতে করিতে অন্তরে শান্তি আসিবে, বিপথগামীদেরও ভিতরে সুমতির সৃষ্টি হইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৭৯
(৯-৯-৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যে অলস হইয়া বসিয়া রহ নাই, তাহা আমি এতদিন পত্র না পাইলেও অন্তরের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মধ্যে কাজ করা বড় কঠিন, কারণ, সারাদিন তাহারা কেবল উদরের ধান্দায় বিহ্বল থাকে। কিন্তু তাহাদের মনকে যদি একবার ভগবানের নামের স্পর্শ দিয়া উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে চির-দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা করিবার মত কাজ করিয়া যাইতে পারে। সৎকার্য্যে টাকাকড়ি দান করিবার আবেদন নিয়া ইহাদের মধ্যে যাইও না, কারণ সম্ভব হইলে আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ইহাদিগকে কিছু কিছু ধনদান করা। যাহাদের আছে, তাহাদের এতই আছে যে, সকলের মধ্যে বণ্টন করিবার সুব্যবস্থা থাকিলে দরিদ্রের দারিদ্র্য এত বাড়িতেই পারিত না। যাহাদের নাই, তাহাদের এমন ভাবেই নাই যে, পরণে নাই বস্ত্র, মুখে নাই অন্ন, হয়ত কাহারো বাস তরুতলে, কাহারো বাস বড় সহরের ফুটপাথে। দিতে পারিলে ইহাদিগকে ধনদান কর্ত্তব্য কিন্তু কি ভাবে দান করিলে ইহারা ভিক্ষুক ও পরানুজীবীর দলে ভিড় বাড়াইবে না, সেইটুকু সতর্কতার প্রয়োজন। দান করিলেই সে দান কাজে আসে না, যদি

সেই দান ভিক্ষাপ্রবৃত্তির না করে উচ্ছেদ। অনেকেই ত এই বিষয় নিয়া ভাবিতেছেন কিন্তু কোনও প্রশংসনীয় কর্ম্মসূত্র এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল দুর্ভাগা নরনারীদের কথা প্রত্যহ আমি ভাবি। মুখের প্রতিটি অন্নগ্রাস গ্রহণ কালে এই কথাগুলি আমাকে আকুলিত করে। কেন মানুষ শুধু যেন-তেন-প্রকারেণ বাঁচিবার প্রয়োজনে এত শ্রম করিতে বাধ্য হইবে যে, তাহার মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড পড়িবে ভাঙ্গিয়া এবং সে চিরজন্ম পশুর মতন ভারবাহী জীবে পরিণত হইয়া রহিবে? তাহার মুক্তির প্রয়োজন আছে। সে মুক্তি না পাইলে বিশ্বস্রষ্টার লীলার মহিমা অন্ধ-তমসায় কলঙ্কিত হইবে।

ইহাও ভাবি যে, ইহাদিগকে অন্নদানের সামর্থ্য যদি আমার নাও থাকে, ইহাদিগকে ব্রহ্মদানের ত সামর্থ্য আমার আছে! ঈশ্বরে চিত্ত লীন হইলে সকল দুঃখ সহিবার ও সকল ক্লেশভার বহিবার স্বচ্ছন্দ সামর্থ্য মানুষের নিশ্চিত আসিবে এবং কোথায় এই দুঃখ-কষ্ট-বেদনার সার্থকতা, তাহাও বুঝিবার মত গৌরবজনক ধী-প্রকাশ ঘটিবে। দেহকে যাহার মুক্তি দিতে পারি নাই, তার অন্ততঃ আত্মাকেও যদি মুক্তির স্বাদ দিতে পারি, তবে তাহার মতই বা আনন্দজনক ব্যাপার আর কি আছে? দরিদ্রের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে বলিয়াই আমি বারংবার তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া যাই। অথচ আমি নিজে এত দরিদ্র যে, নিজের অন্নমুষ্টির জন্যও আমার শ্রম করিবার অবকাশ নাই। আমি নিরন্তর তোমাদের জন্যই খাটিতেছি, নিজ উন্নতি আমার অভিপ্রেত নহে।

প্রণবমন্ত্র সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে, সাধন সম্পর্কে যাহা তোমার উপলব্ধি, আমি স্বীকার করিব, তাহা নির্ভুল সত্য। কিন্তু আমি অবতার হইতে চাহি না। অবতারের জঞ্জালে জড়াইয়া পড়িয়া হিন্দুধর্ম্ম

এমন এক চর্বি-মিশান গব্যঘৃতে পরিণত হইয়াছে যে, ইহা হিতও নহে, মিতও নহে, মেধ্যও নহে, ইহা জোর করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দিব্য গন্ধ উৎসারিত না হইয়া চর্বি-পোড়া বদ্‌গন্ধের বিস্তার দ্বারা কেবল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ, বিচ্ছেদ ও বিরোধের আগুনকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। রামবাবু অবতার হইলে জগদ্বাসীর কি লাভ, তাহা আমি বুঝি না কিন্তু রামবাবু যদি অবতার হইতে পারিয়া থাকেন, তবে শ্যামবাবু কেন এই ডিগ্রীটী পাইবার পক্ষে যোগ্য বিবেচিত হইবেন না? শ্যামবাবু অবতার বলিয়া পূজিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকিলে যুগধর্ম্ম বুঝিয়া যদুবাবুও অবতার উপাধিটী পাইবার পক্ষে অযোগ্য হইতে পারেন না। আর, যদুবাবুই যদি অবতার হইয়া গেলেন, তবে মধুবাবু কি দোষটী করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অবতার করিয়া নিয়া আমরা নানারূপ আধ্যাত্মিক উল্লাস ও পারমার্থিক আড়ম্বড়ে মাতিব না? চেষ্টা করিয়া করিয়া যখন মধুবাবুকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করা গেল, তখন কালীকুমার বাবুর কথাটাও একবার ভাবিতে হয়। তিনিও অল্প দুই চারিজন নিরীহ জীবকে উদ্ধার করেন নাই, দুই চার দশ লক্ষ পারের যাত্রীকে নিজের তরীতে তুলিয়া নিয়া হয়ত ওপারে পৌছাইয়া দিয়াছেন কিম্বা ভব-সমুদ্রের বিপুল বিস্তার নিবন্ধন মাঝ-দরিয়াতে ডুবাইয়া দিয়া বাঁচাইয়াছেন,—তাঁহাকেই বা ধর্ম্মজগতের ডি-লিট্‌ উপাধি—"অবতার"টী দিব না কেন, বল ত! কিন্তু নিতান্ত নিরীহ চরিত্রের গোপাল-গোবিন্দ সমস্ত জীবন ঠাকুরের নাম করিতে করিতে দেহক্ষয় করিবার পরে তাঁর ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিলে বা অন্য নামী নামী অবতারবাদের মধ্যে বসাইয়া দিলে কে কাহাকে অপমান করিল বলিয়া দারুণ এক উত্তপ্ত কলহের সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা অবতার-বাদের

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং ইহাই এই দেশের ধাত। ইহা ধাতস্থ জ্বরের মতন জাতিটাকে এমন আচ্ছন্ন রাখিয়াছে যে, বিশ্ব-বিখ্যাত বৈদান্তিক পুরুষেরা পর্য্যন্ত শেষ তক্ নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া সঙ্ঘসংগঠনকে সহজায়ত্ত করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অবশ্য, কেহ যদি নিজ গুরুকে বা উপাস্যকে অবতার বলিয়া ভাবে, তবে তার চিন্তার ও চেষ্টার স্বাধীনতার উপরে কোনও বিবেকবান্ ব্যক্তিরই হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। সে তার স্বাধীন মতে নিজের পথে চলুক। কিন্তু অবতারে অবতারে কলহ যদি একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, তবে এদেশের মঙ্গল কোথায়?

আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, আমি সাধারণ মানুষ, আমাকে সাধারণই থাকিতে দাও। আমি কাহারও পূজা পাইবার অভিলাষী নহি। আমাকে প্রচার-করাকে আমি আমার কর্ম্মীদের সংগঠন-কর্ম্ম বলিয়া মনে করি না। আমি জীবন ভরিয়া যাহা ভাবিয়া, জানিয়া, বুঝিয়া, করিয়া আসিয়াছি, তাহার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের পরে তোমার আর আমার মধ্যে যদি ইন্দ্রিয়জগদতীত কোনও নিগূঢ় সম্পর্ক কখনও স্থাপিত হয়, তবে তার খবর তোমার আর আমার ছাড়া কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই। কথায় বলে,—

"আপন সাধন-কথা
না কহিও যথা তথা।"

আমার কথা তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রচার করিলে না বলিয়া জগদ্বাসী আমার পথে নামিল না, এমন কথা ভাবিও না। আমার কাজ তোমরা যদি প্রত্যেকে করিয়া যাও, তবে শুধু এই জগৎটাই নহে, এমন

লক্ষ কোটি জগৎকে আমার পথেই পাদচারণা করিতে হইবে। আমি এমন কিছুকে জানিয়াছি, যাহাকে জানিবার পরে নিজের পূজা পাইবার, নিজের প্রশংসা শুনিবার, নিজের দল বাড়াইবার লালচ থাকে না।

সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিয়াও কিছু কিছু কাজ জগদ্বাসীর জন্য করিয়া যাইতেছ জানিয়া আমি সুখী এবং গৌরব-বোধ-দীপ্ত হইয়াছি। তোমার সহধর্ম্মিণীকে সহস্রবার অভিনন্দন জানাইতেছি। সে তোমাকে সহায়তা করিলে ব্রহ্মচর্য্য তোমার পক্ষে অতীব সহজ ঘরে ঘরে প্রত্যেকটী দম্পতি এই দিকে দৃষ্টি দিক্। তাহা দ্বারা মানব-জাতির দেবত্ব বাড়িবে, পশুত্ব লয় পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৩শে ভাদ্র, ১৩৭৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদে সুখী হইয়াছি। আমি চাহি, পরবর্ত্তী প্রত্যেকটী পরীক্ষাতে ইহার চেয়ে ভাল ফল যেন করিতে সমর্থ হও। পড়ার চাপ আপাততঃ একটু বেশী পড়িবে বলিয়া তুমি কাজ সহজ করিবার জন্য জীবনের মূল্যবান একটী বৎসর নষ্ট করিও না মা। অনেকে এরূপ করে এবং মূল্যবান সময় বৃথা অপচয়িত হইল

বলিয়া শেষে করে হা-হুতাশ। পাঠ্য জীবনে সময়ের চেয়ে দামী জিনিষ আর কিছু নাই। যতই কঠিন হউক, পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য তুমি সাহসের সহিত প্রস্তুত হও। যে অধ্যবসায়পরায়ণ ও আত্মবিশ্বাসী, ভগবান তাহাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।

তোমরা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ এবং হরিওঁ-কীর্ত্তন করিবার জন্য তিনটী দূরবর্ত্তী পল্লীতে সদলবলে গিয়াছিলে এবং তোমাদের একাগ্র চেষ্টা ও সুকণ্ঠের গীতিধ্বনি প্রবল ভাব-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। তিনটী স্থানের মধ্যে একটী স্থানের সরল নিরক্ষর দরিদ্র মানুষগুলির প্রাণের স্পর্শ তোমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছ জানিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা ছোটদের অবজ্ঞা করি, অশিক্ষিতকে ঘৃণা করি, দরিদ্রকে বিষদৃষ্টিতে দেখি, কাঙালকে উপেক্ষা করি, দুর্ব্বলকে পদাঘাত করি। এই জন্যই আমরা তাহাদের প্রাণের স্পন্দনটী ধরিতে পারি না, চিনিতে পারি না, উপলব্ধিতে আনিতে পারি না। তাহাদের প্রেম অকপট, ভালবাসা স্বার্থগন্ধহীন প্রীতি নিষ্কলঙ্ক। আমরাই তাহাদিগকে মদ্যপান করিতে শিখাইয়াছি, পাপাসক্ত হইতে প্ররোচিত করিয়াছি, চির-দরিদ্র থাকিতে বাধ্য করিয়াছি। কত শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই অপকার্য্য করিয়া আসিতেছি, তাহার খবর হয়ত লিখিত ইতিহাসগুলি রাখিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, এই সকল সহজ ও সরল মানুষকে আমরাই করিয়া তুলিতেছি কুটিল ও কপট। ইহার প্রতীকার আজ আমাদিগকেই করিতে হইবে। দূর-দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আমাদিগকে ইহাদের নিকটে যাইতে হইবে এবং আমাদের যাহা-কিছু আছে সৎ ও মহৎ, তাহা অকপটে অকুণ্ঠিত চিত্তে উদার হৃদয়ে সদুদ্দেশ্যে বিতরণ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রথম প্রথম ইহারা হয়ত আমাদিগকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। অসদভিসন্ধি-প্রযুক্ত কোনও কোনও বিজ্ঞতাভিমানী ব্যক্তি ইহাদিগকে কুপরামর্শ দিয়া আমাদের প্রতি অকারণে রুষ্ট ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিবার চেষ্টাও করিতে পারে কিন্তু আমাদের তাহাতে দমিয়া গেলে চলিবে না। যে কাজ আমরা সত্য ও হিতপ্রদ বলিয়া জানিয়াছি, তাহা জীবন থাকিতে কদাচ পরিহার করিব না।

ইহাদের ভিতরে কাজ করিতে গিয়া তোমরা প্রচুর আনন্দ পাইতেছ জানিয়া আমার খুশীর অবধি নাই। লক্ষ্য রাখিও, তোমাদের কাহারও অসতর্ক আচরণ যেন ইহাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে। সেবা করিতে যাহারা যাইবে, তাহারা যেন সেবাধর্ম্মের পূর্ণ সাত্ত্বিকতা রক্ষা করিয়া চলিবার অঙ্গীকার হইতে কদাচ কক্ষভ্রষ্ট না হয়। সাময়িক চাঞ্চল্য বা বৃথা বাক্-চাপল্য অনেক সময়ে অনেক বড় বড় কাজকে পঙ্গু করিয়া দিতে সমর্থ হয়, এই কথাটী মনে রাখিয়া চলিও। তোমাদের ঐ কাছাড় জেলার কুমারী কন্যারা যে ভাবে অধিক সংখ্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছ, তাহাতে তোমাদের সম্পর্কে এই একটুকু সাবধানতার কথা আমাকে বিশেষ ভাবে বলিতে হইতেছে। তোমরা দিগ্বিজয় কর, ইহা আমি চাহি। সেই দিগ্বিজয় যেন দেবী শক্তির হয়, মোহিনী মায়ার না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রিংশতম খণ্ড

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩ ভাদ্র, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের সকলের পত্রই পাইয়াছি এবং পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে যাহাকে যখন যে পত্র দেই, তাহা সকলকে দেখাইবে। কারণ, একখানা পত্রে দশজনেরই প্রয়োজনীয় কথা থাকে।

রামনগরে তোমরা একটী নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ এবং প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই মণ্ডলী ভাল ভাবে চলিতেছে, জানিয়া সুখী হইলাম। তিন, চারি, পাঁচ জন লোককে সমভাবের ভাবুক এবং সমাদর্শের সেবক করিয়া লইয়া একত্র মিলিত করার নাম অখণ্ডমণ্ডলী গঠন। ইহার উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন। সম্প্রদায়-বিস্তার আমাদের লক্ষ্য নহে, আমাদের লক্ষ্য হইতেছে, সাধ্যমত সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের একটী অসাম্প্রদায়িক মিলন-মঞ্চে টানিয়া আনা। জগতে সম্প্রদায় অসংখ্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কত কত হইবে। অতীতের সম্প্রদায়-সমূহ মুখে সৌভ্রাত্রের বুলি আওড়াইলেও কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেই যে ধূমায়িত এবং ক্রমশঃ বহ্নি-মালা-পরিশোভিত করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য ঐতিহাসিক নজীর রহিয়াছে। এক সম্প্রদায়ের লোককে কৌশল করিয়া বা ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ে টানিয়া আনার চেষ্টার মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে বিদ্বেষ তার কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের যাবতীয় কার্য্যক্রমকে এই বিদ্বেষের নাগালের বাহিরে রাখিতে

চাহি। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাদের গৃহীত সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল না বলিয়া আমাদের আফশোষ থাকিবে কেন? আমরা সকল ধর্ম্মের লোকদের নিয়া একাসনে বসিয়া ভগবানকে ডাকিব, নামজপের নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইষ্টনামই জপিবে, কাহাকেও নিজ দীক্ষাপ্রাপ্ত নামের সাধন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না,—ইহাই ত আমাদের সমবেত উপাসনার প্রধান প্রকরণ। ভিন্ন-মতাবলম্বীরা একত্র বসিয়া সাধন করিতে শিখিলে পরস্পরের মধ্যে যে তুলনাহীন ভ্রাতৃত্ব-বোধের উদয় হইবে, সমবেত উপাসনার পরমলোকহিতকর শুভফল হইতেছে তাহা। সমবেত উপাসনাটীই অখণ্ডমণ্ডলীর প্রধান উপজীব্য হওয়াতে মণ্ডলী স্থাপন দ্বারা তোমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসার সাধনে সহায়তা করিতে যাইতেছ। সম্প্রদায়-বিস্তারের উন্মাদনা নিয়া নহে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ-বিস্তারের এই সাত্ত্বিক উল্লাস নিয়া তোমরা পল্লীতে পল্লীতে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া চল। ভক্তিমান্ ও সাধনশীল পাঁচ দশ জনে মিলিত হইয়া যদি কোনও নূতন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হও, তবে অনুরোধ-উপরোধের বলে নহে, তোমাদের আদর্শ-নিষ্ঠার বলে তোমরা প্রত্যেকটী গ্রামে একটা করিয়া নূতন অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত করিয়া দিয়া আসিতে পারিবে। আদর্শের শক্তি, দৃষ্টান্তের প্রভাব আর চরিত্রের বল একত্র সমন্বিত হইলে তোমরা মানুষের মনকে বন্যার জলের মতন ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, নাচাইয়া নিয়া চলিতে সমর্থ হইবে। চারিদিকে তোমরা কি দৃশ্য দেখিতে পাইতেছ? প্রায় সবগুলি সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুদেবের মূর্ত্তি বা প্রতিচিত্র পূজার প্রবর্ত্তনেই সর্ব্বশক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছেন। কাহার গুরুদেব পূর্ণাবতার, কাহার গুরুদেব অংশাবতার, কোন্ গুরুদেব ষোল আনা অবতার, কোন্ গুরুদেব আঠার আনা

অবতার, কোন অবতার কোন্ দেবতার বা কোন্ দেব-মানবের পরবর্ত্তী মানব-প্রতীক, কোন্ অবতার কোন্ অবতারের সাহিত একাসনে বসিবার যোগ্য বা অযোগ্য, এই সকল কলহ-কচায়নের তুমুল বিতণ্ডা প্রকাশ্যে বা লোকলোচনের অন্তরালে প্রায় সবগুলি সম্প্রদায়ের বিস্তার-কৌশলের পশ্চাতে সক্রিয় ভাবে কাজ করিতেছে। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি সৌভ্রাত্র্য-বুদ্ধি আসিবার অবকাশ কোথায় ? কিন্তু তোমাদের সমবেত উপাসনায় আমার মূর্ত্তি পূজা করিবার বা পূজার বেদীতে বসাইবার কোনও অবকাশ নাই। সমবেত উপাসনা কালে আমি তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন সমসাধক মাত্র। যে আমাকে গুরু বলিয়া কদাচ মানিবে না, যে আমাকে এমনকি অন্য দশ জন মহাপুরুষের ন্যায় ছোট বা বড় একজন মহাপুরুষ বলিয়াও সম্মান দিতে প্রস্তুত হইবে না, সেও একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাকে সমবেত উপাসনায় তাহার সঙ্গে সমাসনে বা একাসনে বসিতে দিতে আপত্তি করিতে পারে না বা পারিবে না। অন্য দশ জন সাধারণ মানুষের সঙ্গে উপাসনায় বসিতে যাহার আপত্তি নাই, সে আমাকে অতি সাধারণ মানুষ বলিয়াই বা অবজ্ঞা করিবে কেন ? নীচ, হীন, দীন, দুর্ব্বল, পাপী, তাপী, অপরাধী ও সর্ব্বতোভাবে অবহেলিত অবজ্ঞাত অন্ত্যজ মানুষেরও যেই সমবেত উপাসনায় বসিবার অধিকার আছে, সেই উপাসনাতে আমার মত একটী সাধারণ লোককে শুধু নগণ্য হইবার অপরাধে কেহ সমবেত উপাসনার আসরে অপাংক্তেয় মনে করিবে না। গুরুরূপে নহে, মহাপুরুষ রূপে নহে, সাধারণ মানুষ রূপে, এমনকি একজন অতীব নিকৃষ্ট, হেয় ও অবজ্ঞেয় মানুষ রূপেও ত আমি সমবেত উপাসনার আসরে সকলের সঙ্গে এক কণা আসন দাবী করিতে পারি !

বিশ্বভ্রাতৃত্বের পবিত্র বেদীমূলে গুরুদেব স্বরূপানন্দ, মহাপুরুষ স্বরূপানন্দ, কর্ম্মযোগী স্বরূপানন্দ, বাগ্মীবর স্বরূপানন্দ, কবি স্বরূপানন্দ, দেশ-প্রদেশ-ব্যাপী বিপুল ধর্ম্ম-সংগঠনের সংগঠয়িতা স্বরূপানন্দ নিজ নিজত্বকে বলি দিয়া রাখিয়াছে। সে জগতে কাহারও পূজা চাহে না। সে চাহে প্রতিটি মানুষের সহিত প্রতিটি মানুষের মিলন—তোমাদের সমবেত উপাসনা সেই মিলনের সেতু। নিজেকে মানব-সভ্যতার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বরূপানন্দের ধর্ম্মপ্রচার নহে, মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্যই তাহার ধর্ম্ম।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩ ভাদ্র, ১৩৭৯

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার সহিত তোমার পরিচয় নাই, তথাপি তুমি কত অকপটে পত্রখানা লিখিয়াছ। অত দূর দেশে থাকিয়া এবং আমাকে কখনো না দেখিয়াও তুমি আমাকে এত আপন বলিয়া ভাবিয়াছ জানিয়া অন্তরে অগাধ আনন্দ অনুভব করিতেছি। পরিচিত অপরিচিত সকলের আমি আপন হইতে পারিলে আমার মানব-তনু-ধারণ সার্থক হইবে।

তোমার যে বন্ধুটীর মানস-সঙ্কটের কথা লিখিয়াছ, তাহাকে আশ্বাস দিও যে, বর্ত্তমানে যে মোহের জালে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা

হইতে তাহার যেন অচিরে মুক্তিলাভ ঘটে, তজ্জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ও তজ্জন্য শ্রীমানকে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তরুণ এবং তরুণীদের মধ্যে মনের এই সুলভ দুর্ব্বলতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়,—"উহাকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং উহাকে আমার বিবাহ করাই চাই,"—কিম্বা,—"সে আমাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছে, আমার সহিত ছাড়া অন্য কাহারও সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে দ্বিচারিণী হইবে, সুতরাং আমি তাহাকে কোনও ক্রমেই ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না।" মনের আবেগে তরুণেরা এই জাতীয় কত কথাই কহে কিন্তু তাহারা জানে না যে, এই আবেগ বর্ষাকালের নদীনালার ক্ষণিক পঙ্কিল স্রোত মাত্র,—বর্ষার অপগমে এই নালাতে এক কণা কর্দ্দমও হয়ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, জলের কথা দূরেই থাকুক। মনের এইরূপ অবস্থায় মনের আবেগের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া না দিয়া শক্ত হাতে মনকে কব্জা করিতে হয় এবং বলিতে হয়,—"তোমার কথা আমি শুনিব না, আমার কথাই তোমাকে শুনিতে হইবে,—আমি অত সস্তায় নিজেকে বিকাইয়া দিব না।"

এদেশে পরিবার সৃষ্ট হয় পিতামাতার স্নেহকে আশ্রয় করিয়া, পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নহে। ডানায় ঝাপট দিতে শিখিলেই এদেশের ছেলেরা পিতামাতাকে অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করিয়া অন্যত্র গিয়া সঙ্গিনী সহ নূতন কুলায় রচনা করে না। বিবাহিত হইবার পরে নব-দম্পতীই শুধু নহে, তাহাদের পুত্রকন্যারাও মূলবৃক্ষটীর স্নিগ্ধ ছায়াতলে প্রাণ জুড়াইবার প্রত্যাশা রাখে। এমন দেশে পিতামাতার মনে ক্লেশ দিয়া তাহাদের অসম্মতিতে কোথাও বিবাহ করা কেবল নৈতিক দৃষ্টান্ত হিসাবেই অন্যায় নহে, নিজের প্রতিও নিজে অন্যায় করা হয় বলিয়া

জানিতে হইবে। বিবাহ মানুষ সুখশান্তির জন্যই করে, পিতামাতার অমতে বিবাহ করিয়া খুব কম লোকেই এদেশে সুখী হইয়াছে।

পিতামাতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হওয়া এদেশের এক মৌলিক শিক্ষা! পিতামাতা কেবল জন্মই দেন নাই, তাঁহারা কেবল লালন, পালন ও পোষণই করেন নাই, তাঁহাদের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ রহিয়াছে, সন্তানের ভিতরে তাহার প্রকটতর প্রকাশের এক বিপুল সম্ভাবনাকে তাঁহারা সম্পুটিত করিয়া দিবারও উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়াছেন। অতীতের পিতা এবং পিতামহেরা এই কথা জানিতেন এবং তোমরা ইহা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছ। কিন্তু তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই একটী জৈবিক সত্য, যাহার ভিত্তি একান্তই বৈজ্ঞানিক, তাহা মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না।

তোমার বন্ধুটীকে এই ধারায় চিন্তা করিতে বল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার চক্ষু ফুটিয়া যাইবে। পাখীর যদি চোখ না ফোটে আর সে যদি খুব ডানা ঝাড়িতেই শিখে, তাহা হইলে সে উড়িয়াই বা যাইবে কোথায়? কোন্ পাদপের শাখায় বসিয়া সে তাহার আশ্রয়-তরুর মহিমা উপলব্ধি-গত করিবে? শূন্য আকাশে শুধু শুধু উড়িয়া বেড়াইবার মধ্যে বিশেষ কোন্ সার্থকতাটুকু আছে? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

২৩শে ভাদ্র, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের কাহারও কাহারও কর্ম্মতৎপরতার সংবাদে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের কর্ম্মরুচি অনন্তকালস্থায়ী হউক।

মণ্ডলী গড়িয়া মনে মনে ভাবিবে, "মণ্ডলী ত গড়িলাম না, রচিলাম শ্রীগুরুর একটী সজ্ঘময়ী মূর্ত্তি, একটী মনোরম প্রতিমা, যাহার অঙ্গে কোনও প্রকার আঘাত আমি কদাচ দিতে পারি না, যাহার প্রতি আমার থাকিবে নিয়ত প্রেমময়ী দৃষ্টি, যাহার সেবার ভিতর দিয়া আমি খুঁজিয়া বাহির করিব আমার জীবনের পরম সার্থকতা এবং চরম সম্পদ।"

আত্মসেবায় যার যত অরুচি, স্বার্থসাধনে যার যত বিরক্তি, মণ্ডলীর সেবা সে তত নিখুঁত ভাবে করিতে পারিবে। তোমরা প্রত্যেকটী মণ্ডলীর সেবকেরা সজ্ঘের সেবা করিতে নামিয়া আত্ম-অহঙ্কার, উদ্ধত দর্প এবং পরদোষ-উদ্‌ঘাটনে তৎপরতা একেবারেই বর্জ্জন করিও।

তোমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলী একদিন বড় হইবে, এই বিশ্বাসটুকু অন্তরে নিরন্তর জাগাইয়া রাখিও। মণ্ডলী বড় হয় ঐক্যের বলে, নিষ্ঠার বলে, পারস্পরিক সম্প্রীতির বলে আর সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ হইতে একচুলও না নড়িয়া অবিরাম কর্ম্মের গতি ও সাত্ত্বিকতা বর্দ্ধনের বলে। এইগুলি মহাবলের উৎস। সাধন করিয়া এই উৎসের সঙ্কীর্ণ মুখটীকে বৃহৎ করিতে হয়।

একের শক্তিতে এই যুগে জগতে কত কাজ আর হইতে পারে? সত্যযুগে নাকি হইত। এখন সঙ্ঘেই শক্তি, ঐক্যেই বল, সংগ্রনরের সম্মেলনেই নারায়ণ। মণ্ডলী গড়িয়াছ শক্তি বর্দ্ধনের জন্য। যদি আত্মকলহ কর, শক্তি খণ্ডিত হইয়া যাইবে, অমিত শক্তি সীমিত হইবে, নিঃসীম শক্তিও নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কলহের কোনো সূচনা দেখিলে, বিনয় দিয়া, ভদ্রতা দিয়া, বিচার-বিবেচনা দিয়া, দূরদৃষ্টি সহায়ে তাহাকে অঙ্কুরেই উৎপাটন করিবে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লইয়া তোমাদের আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তার করিতে হইবে জগতের হিতকল্পে। স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে তোমরা মণ্ডলী গড় নাই। এমনকি নাম-যশের লোভকেও তুচ্ছ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৭৯
(১২-৯-৭২ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,আমার প্রাণভরা সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিও। দারুণ যন্ত্রণাপ্রদ গলক্ষতরোগে তোমার স্বামীর অকাল-বিয়োগ ঘটিয়াছে সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কিন্তু বাপের বেটা বীরের মতন ভগবানের নাম জপিতে জপিতে দেহ ছাড়িয়া দিয়াছে। একথা শুনিয়া খুশীতে মনটা

ভরিয়া উঠিল। তার মতন আমরা যেন প্রত্যেকে ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতেই কায়ার মায়া ছাড়িতে পারি, এই প্রার্থনা করি। সে নির্ভয়ে মরিয়া আমাদের প্রতিজনকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং নামে রুচির জলন্ত জাগ্রত অটুট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গেল। তুমি ধন্য যে, এমন একটী ব্যক্তির সহধর্ম্মিণীরূপে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু অতিবাহিত করিতে পারিয়াছ। নিশ্চয়ই তাহার সহিত সুদীর্ঘ বস-বাস-কালে তাহার চরিত্রের আরও কয়েকটী বিশেষ প্রশংসনীয় গুণের তুমি প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছ। সেই সকল সদ্‌গুণের অনুচিন্তন এখন তোমার জীবনের এক পরম রমণীয় উপবন হইবে। তুমি তাহার সদ্‌গুণগুলির মধ্যে তোমার অন্তরে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লও।

শ্রীমানের আত্মার আমি শান্তি কামনা করিতেছি। কিন্তু সে যখন ভগবানের নাম করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়াছে, তখন আমি বা অন্য কেহ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুক বা না করুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। সে তাহার নিজের ক্ষমতা-বলেই অনন্ত জীবনের পরম প্রশান্তি লাভ করিবে।

তুমি অবলা নারী, সমাজের লোকের সামনে তাহার শ্রাদ্ধ অখণ্ড-মতে করিতে পার নাই বলিয়া মনে অনুশোচনা রাখিও না। শ্রাদ্ধ যে মতেই কর, তাহা প্রধানত মনের সান্ত্বনার জন্য এবং শোক-অপনোদনের প্রয়োজনে। সকল রকমের শ্রাদ্ধেরই আত্মিক শুভফল এক। এখন যে সকল সমাজপতিরা তোমাকে তোমার স্বামীর রুচি অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে দিলেন না, কালের বিবর্ত্তনে হয়ত একদা তাঁহারাই দলে দলে নিজেদের শ্রাদ্ধ অখণ্ডমতে করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন। যুগের প্রয়োজনে প্রতিটি প্রথারই নানা রূপ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

তোমরা নিজ নিজ সাধনে একান্ত ভাবে নিষ্ঠাশীল হইয়া চলিতে থাক আর কালপ্রতীক্ষা কর। ভগবানের অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছাতেই সব-কিছু ঘটিতেছে। সমাজপতিদের উপরে রাগ করিও না। তাঁহারা জ্ঞানের বশ নহেন, প্রথার দাস। শক্তিমান পুরুষেরা আসিয়া এক একটা প্রথার রূপান্তর সাধন না করিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা পূর্ব্বাচরিত নিয়মকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখেন। এক হিসাবে ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যও বটে। তাঁহাদের শাসন সত্বেও আস্তে আস্তে অনেক নবপ্রবর্ত্তন ও নব-পরিবর্ত্তন আসিবে এবং প্রবল বেগে যখন তাহা আসিবে, তখন তাঁহারা সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সম্মুখে নিশ্চয়ই মাথা নত করিবেন।

তোমাদের ঐ গ্রামটীর মধ্যে পর পর তিনটী মানুষ কণ্ঠের ক্যান্সারে মারা গেল দেখিয়া একদল লোক হঠাৎ সুযোগ বুঝিয়া স্ত্রীলোক ও শূদ্রের ওঙ্কার-ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র জপের ইহা কুফল বলিয়া চীৎকার করিতেছে জানিয়া অবাক্ হই নাই। কারণ, কাক যখন উড়িয়া গেল, তখন তালটী কাকেই যে সুনিশ্চিত নিক্ষেপ করিয়াছে, এরূপ কুযুক্তি অশিক্ষিতদের মধ্যে অচল নহে। এসকল কুযুক্তিকে বালকের বাক্যালাপ বা পাগলের প্রলাপ জানিয়া এককথায় অগ্রাহ্য করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোক এবং শূদ্র ওঙ্কার-গায়ত্রী উচ্চারণ করিলেই যদি ক্যানসার রোগ হইবে, তবে তোমাদেরই ঐ রাজ্যে ডিব্রুগড়ে তিন শত জনের, গৌহাটিতে চারি শত জনের, তিনসুকিয়ায় পাঁচ শত জনের, করিমগঞ্জে ছয় শত জনের এবং শিলচরে এক হাজার জনের ক্যানসার হইল না কেন? তাহারা ত সকলে ব্রাহ্মণ নামধারীদের ঘরে না জন্মিয়াও অবিরাম ওঙ্কার জপিতেছে, গায়ত্রী-গান গাহিতেছে। এসব যুক্তি কুযুক্তি। কাণেও তুলিও না।

মানুষকে আরও কুযুক্তি করিতে শোনা যায়। একজন নামজাদা গুরুদেব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, শূদ্র ও স্ত্রীলোক প্রণব-গায়ত্রী জপ করিলে তাহাদের কামোত্তেজনা দারুণ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার এই মিথ্যা উক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য তিনি আবার উপনিষদের গল্পকে ব্যাখ্যাস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এসব ব্যাখ্যা এতই ছেলে-মানুষী ব্যাপার যে, পড়িতে বসিলে হাসি আসে। কিন্তু এসব কথা নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করিতে এবং বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করিতে সরল-বিশ্বাসী গ্রাম্য লোকদের আটকায় না। একটা ঢোক গিলিবার কষ্টটুকু স্বীকার না করিয়া এসব কথা সাধারণ লোকেরা হাঁ করিয়া গিলিয়া যায়। সাধারণ লোকদিগকে অসাধারণ ব্যক্তিরা এই ভাবে অবিরাম এত নাকানি চুবানি দিতেছেন যে, দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির অবস্থা সমুদ্রে পতিত জীর্ণ ভেলার ন্যায় হইয়া পড়ে। কিন্তু তুমি মা তোমার আদর্শে শক্ত হইয়া লাগিয়া থাক। যে দীক্ষা আমি তোমাকে দিয়াছি, তাহা সত্যময়ের সত্য নামে নির্ভুল সত্য দীক্ষা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আসিয়াও অন্যরূপ যুক্তি দেখাইতে বসিলে তুমি সেই কুযুক্তি মানিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৭ ভাদ্র, বুধবার, ১৩৭৯

(১৩-৯-৭২ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি তোমার ঠিকানা দাও নাই, আমি আন্দাজে এক ঠিকানা লিখিয়া পত্রের জবাব দিতেছি, অনেকেই অসম্পূর্ণ নাম ও অস্পষ্ট ঠিকানা দিয়া পত্র লেখে। কেহ কেহ নিজের সংক্ষিপ্ত নামটুকুই মাত্র লেখে, ঠিকানা লিখিতে ভুলিয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলেও এসব পত্রের আর জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রতিখানা পত্রকে আমি যক্ষের ধনের মত রক্ষা করি, কোনও না কোনও সময়ে উত্তর নিশ্চিতই দিব বলিয়া।

আসামের এক উদ্বাস্তুশিবিরের আশ্রয়ার্থী যুবক বিহারের আর এক উদ্বাস্তু শিবিরের আশ্রয়ার্থী ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধার করিলেন, তুমি বিবাহিতা হইলে। কিন্তু তোমার সন্তানাদি হইল না। মাত্র এই দোষে তোমাকে তোমার স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া বড়ই দুঃখ পাইয়াছি। সন্তান কেন হইল না, এই যুক্তিতে কোনও স্ত্রী ত কদাচ তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে না! তোমার স্বামী এই ব্যাপারে গুরুতর অবিচার এবং মারাত্মক অন্যায় করিয়াছেন। তিনি আর একটী পত্নী লইয়া সুখে সংসার করিবেন আর তুমি একাকিনী উদ্বাস্তু-শিবিরের আশ্রিত বৃদ্ধ পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে, ইহা ভাবিতেও মনে ক্লেশ জাগে। জানি না, তোমার স্বামীর মত-পরিবর্ত্তনের কোনও পথ আছে, কি না। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তাহার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করাও। তাহাকে অপমান-অসম্মান করিয়া যেন কোনও চেষ্টা না করা হয়, বরং শিষ্ট বচনে বুঝ-প্রবোধ দিয়া তোমাকে ঘরে ফিরাইয়া নিতে বিশেষ ভাবে বারংবার অনুরোধ করানো দরকার। দেশের বর্ত্তমান আইনের দরুণ হিন্দুর সংসারে একটী স্বামীর দুইটী স্ত্রী নিয়া বাস কঠিন হইলেও এক-জনকে নিরাশ্রয়া ভিখারিণী করিয়া রাখিবার অধিকার কোনও স্বামীর নাই।

ইহা ত গেল একদিকের কথা। আর এক দিকের কথা হইল এই যে, তোমাকে অবিলম্বে স্বাবলম্বিনী হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। জীবিকার্জ্জনের মতন কোনও স্থূল বা সূক্ষ্ম শিল্প শিখিতে হইবে। জামা সেলানো, কাঁথা সেলানো, উল বোনা, চিত্রাঙ্কন, সাইনবোর্ড লেখা, নিত্যবিক্রয়যোগ্য সাধারণ খাদ্যবস্তু—যেমন নাড়ু, মোয়া, আচার, মোরব্বা, সন্দেশ প্রভৃতি—তৈরী করা শিক্ষা করিয়া সেই পথে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই সব শিখিবার সুযোগ না থাকে ত' কাগজের ঠোঙ্গা বা গোবরের ঘুঁটে তৈরী করাও জীবিকার্জ্জনের দিক দিয়া একটা কম বিদ্যা নহে। হাজার হাজার নিঃস্ব নারী এই ভাবে জীবনোপায় আহরণ করিতেছে। যদিও চারিদিকে তীব্র বেকার-সমস্যা, তবু প্রকৃত কর্ম্মী লোক ইহার মধ্য দিয়াই নিজের চলিবার পথটুকু করিয়া নেয়। যত লোক বেকার-সমস্যা লইয়া আন্দোলন করিতেছে, তাহাদের সিকি অংশও এই জিদ করিয়া কাজ খুঁজিতেছে না যে, "মরি আর বাঁচি, কঠোর শ্রম করিবই, খাটিতে খাটিতেই বরং শেষ হইয়া যাইব, তথাপি নিজের অন্ন অর্জ্জন করা আমার চাই।" অনেকেই অপরের দয়াদত্ত একটী চাকুরী চাহে কিন্তু চাকুরীটী ছোট গ্রেডের হইলে কাজ না করিয়া মাহিনা চাহে, যোগ্যতা না দেখাইয়া পদোন্নতি চাহে। ছোট হউক, তুচ্ছ হউক, একটী কাজে হাত দিয়া তাহাতে হাত পাকাইবার জিদ নিয়া লাগিয়া থাকিলে অনেককেই একই জীবনে বারংবার বেকার হইতে হইত না। তোমার নিজের অন্ন নিজের শ্রমে অর্জ্জন করা চাই, এই সঙ্কল্প নিয়া পৃথিবীটাকে নূতন করিয়া দেখিতে সুরু কর। সুযোগ সুবিধা আপনা আপনি আসিয়া নাও জুটিতে পারে কিন্তু যে একান্ত চেষ্টায় সুযোগ চাহে, সে সুযোগ পায়। তুমি বৃদ্ধ পিতার গলগ্রহ না হইয়া কি করিয়া বাঁচিয়া

থাকিতে পার, তাহার চেষ্টায় লাগ। তুমি আমার সন্তান। মনে রাখিও, আমার সন্তান জীবনের প্রতিটী পদবিক্ষেপে স্বাবলম্বী হয়। চেষ্টা করিতে থাক, নিশ্চিত পরমেশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তাঁহার অপার প্রেম্ ও করুণা তোমাকে নিয়ত রক্ষা করিবে। আমি সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি, একথা বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৭ ভাদ্র, ১৩৭৯
(১৩-৯-৭২)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। মায়েদের এবং শিশুদের স্নেহ ও আশিস দিও।

তোমাদের পূজা পাওয়া আমার প্রয়োজন নহে। আমি চাহি তোমরা প্রতিজনে জগতের কল্যাণে লাগো। এই জন্যই আমি বারংবার আসি আর যাই। আমাকে সাধারণ একজন শিষ্যলোভী গুরুর পর্য্যায়ে ফেলিয়া তোমরা বিচার করিও না। আমাকে বুঝিতে হইলে আমার প্রতিটি বাক্য এবং আচরণ ওজন করিয়া দেখিতে হইবে। আমি নিজের স্বার্থের জন্য জীবনে কোনও কাজ করি নাই এবং কদাচ করিব না।

* * * *

তোমাদিগকে দেখিলে আমার প্রাণে কত আনন্দ হয়। কিন্তু তাহা কি এই মায়িক জগতের সস্তা আনন্দ? তোমরা জনে জনে জগতের কল্যাণের জন্য তিলে তিলে নিজেদিগকে সাধ্যমত উৎসর্গ করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিবে এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্যোগে ও উদ্যমে নিয়ত ব্রতধারী থাকিবে, এই জন্যই আমার এই অপরিসীম আনন্দ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

রাজগীর (পাটনা)

৩০শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৭৯

(১৬-৯-৭২)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্বামী যদি স্ত্রীকে করে অত্যাচার আর স্ত্রী যদি স্বামীকে করে অবিশ্বাস, তবে সেই সংসার যেন দাবানলের মতন জ্বলিতে থাকে। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে যদি বা শান্তির সলিল-সিঞ্চন সম্ভব হয়, তথাপি সকলের চোখের আড়ালে তূষের অনল ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। এই অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মান্তিক। তোমরা নিজেদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে খোলাখুলি কথা বলিয়া নিজেদের মনের ভ্রম মিটাইয়া ফেল। ত্রুটি দুই দিকে সমান নাও থাকিতে পারে, কাহারও হয়ত দোষটা বেশী, কাহারও কম। কিন্তু সত্যিকারের শান্তি ও প্রীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইলে ক্ষমা

এবং সহিষ্ণুতা থাকা প্রয়োজন দুই জনেরই সমান। সুযোগের সন্ধানে থাক যে, কখন তদ্রূপ অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়।

কোপনস্বভাব স্বামীকে ক্রোধ দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। মৃদুতাও সকল সময়ে কার্য্যকর হয় না। কিন্তু নিজে আঘাত পাইলেও স্বামীকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিবে না, এই পণটা মনে রাখিয়া স্ত্রী যদি দীর্ঘকাল চলিতে পারে, তবে অনেক সময়েই একান্ত পশুস্বভাব স্বামীর মত-পরিবর্ত্তন ঘটে, এরূপ দেখিয়াছি। বিবাহ তোমাদিগকে একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শ দান করিতে পারে নাই, কারণ দুইটী ভিন্ন পরিবেশে দুই জনে আবাল্য লালিত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ। কিন্তু দীক্ষাসূত্রে তোমাদের মধ্যে একটা আদর্শগত ঐক্যবন্ধন নৈতিক ভাবে হইলেও আসিয়াছে। সুতরাং তোমাদের হতাশ হইয়া যাইবার কারণ নাই।

দীক্ষা লইল হুজুগে পড়িয়া দলবল সহ অথচ দীক্ষালাভের পরে নব-প্রদর্শিত পথে চলিবার দিকে কোনো আগ্রহ দেখাইল না, কেবল বাহিরের লোকের কাছে মোড়লী খাটাইয়া সকলের মাথার উপরে ছড়ি ঘুরাইবার জন্য যেটুকু মৌলিক শিষ্টাচার পালন অত্যাবশ্যক, মাত্র তত্তটুকুরই দায় রাখিল, এমন ব্যক্তিদের জীবনে অতীব মহান্ ও শক্তিধর গুরুর প্রদত্ত দীক্ষাও যথাসময়ে নবজীবনের বিকাশ ঘটাইতে ব্যর্থ হয়। বিনম্রস্বভাব আজ্ঞাপালন এমনই একটী অত্যাবশ্যক সর্ত্ত, যাহা অনুসরণ করিলে দীক্ষালব্ধ শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ ও সম্যক্ বিকাশ একটী অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। স্বামী ও স্ত্রীতে কলহের মাত্রা কমাইয়া যদি উভয়ে সেই দিকে নজর দাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমাদের শত জন্মের সৃষ্ট নানা কৃত্রিম ব্যবধান দূর হইয়া গিয়'ছে, তোমরা একে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ, একে অপরের প্রতি দরদী হইয়া উঠিয়াছ।

তোমরা পরস্পর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী না হইলে তোমাদের পুত্র-কন্যাগুলিও যে তোমাদের দূর ও পর হইয়া থাকিবে, সেই নিদারুণ পরিণতিটীর কথা কখনো ভাবিয়াছ কি? গৃহে মাতাপিতা বিদ্যমান, গৃহে নাই শান্তির ছন্দাংশ মাত্র, ইহারা শান্তির আশায় যদি বাহিরের পানে তাকায়, তবে সর্ব্বনাশও ঘটিয়া যাইতে পারে। পুত্র বিবাহের যোগ্য নহে, তবু সে বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে গোপনে কুটুম্বিতা করিবে। কন্যা বিবাহযোগ্যা, সে কখন কাহার কোন্ মধুর সম্বোধনে সহানুভূতিপূর্ণ দরদভরা জবাব দিতে গিয়া কোন্ মারাত্মক ভুল করিয়া বসিবে, কে তাহা আগে হইতে ভাবিয়া রাখিতে পারে? পাঁচটা মদমত্ত হস্তীকেও বশ করা সহজ কিন্তু একটা যৌবনোন্মাদিতা যুবতী কন্যাকে বাগে রাখা সহজ নহে। তোমাদের অন্য দশ পাঁচটা সমস্যার চেয়ে এই সমস্যাটী অনেক বড় এবং অনেকগুণ মারাত্মক। কেন সে দুই চারি দিন পরে পরে নির্দ্দিষ্ট একটী যুবকের সঙ্গে দেখা করে, হাসে, খেলে, সিনেমা দেখে, বাজার করিতে যায়, এ প্রশ্ন তুমি করিতে পারিবে না, সে তাহা সহ্য করিবে না। কেন সে নির্দ্দিষ্ট একটী পুরুষকে সর্ব্বকর্ম্মে আস্কারা দিতে দিতে ক্রমশঃ দুঃসাহসী ও দুরাকাঙ্ক্ষ করিয়া তুলিতেছে, এই প্রশ্ন তুমি তুলিতে পারিবে না, তুলিলে সে ইহা তাহার পক্ষে চরম অপমান বলিয়া গণ্য করিবে। প্রতিবেশীরা যদি ঠাট্টা করে, গৃহের অন্য দু-পাঁচটী পরিজন টিপ্পনী কাটে, তোমাকে তাহা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিনা মন্তব্যে শুন-নাই ভাণ করিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে, কি শুনিলে তাহা কন্যার কাছে বলিবার পর্য্যন্ত তোমার অধিকার নাই, কারণ, কন্যা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিবে, অন্য-লোকের ত কোনো মাথাব্যথা নাই, তুমিই কথাগুলি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছ, তুমি জালিয়াৎ তুমি মিথ্যাবাদী। অসাধারণ এক সুদুর্ল্লভ কিন্তু

অবাঞ্ছনীয় আত্মসম্মানজ্ঞান আসিয়া যেন ভূতের মতন কন্যার স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে। সে ভুলিয়া যাইবে যে, তুমি যদি কিছু ভাবিয়া থাক বা বলিয়া থাক, তবে তাহা কন্যার প্রতি আক্রোশ-হেতু নহে, বিদ্বেষ-বশত নহে, তাহাকে হেয় জ্ঞান করিয়া নহে, শুধু তাহার ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া। অভিভাবক যদি তাহার শ্যেনদৃষ্টি উপসংহৃত করে এবং এই প্রশ্রয়ের সুযোগে যদি কোনও ভদ্রবেশী অসৎ-ব্যক্তি কোনও গুরুতর অনিষ্ট মেয়েটীর উপরে করিয়া যায়, তবে তাহার দায় কে নিজ স্কন্ধে বহন করিবে? এই জন্যই বুদ্ধিমান্ অভিভাবকেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে ঘরে পুষিয়া অনূঢ়া রাখিতে মোটেই আগ্রহী হন না। কিন্তু অল্পশিক্ষিতা মেয়েরা সাধারণতঃ পিতামাতার কথার যে মূল্য দেয়, শিক্ষিতা মেয়েরা তাহা দেয় না। ইহা এক পরম অশান্তির কারণ হইয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহা তোমার নিকটে স্পষ্ট হইবে যে, প্রধানত এই কারণে কিছু কিছু সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রলোকেরাও নিজ নিজ কন্যার উচ্চ শিক্ষা পছন্দ করেন না। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহারা অত্যন্ত কাঁচা বয়সেই কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া ভাবী উদ্বেগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করেন।

মেয়েরা যদি না বোঝে যে, তাহাদের অসতর্ক আচরণের দ্বারা তাহারা পিতামাতা বা অভিভাবকদের সম্মান অনায়াসে লুটাইয়া দিতে পারে, তাহারা যদি না বোঝে যে, পিতামাতা বা অভিভাবকেরা তাহাদিগকে লালন, পালন, শিক্ষাদান আদি করিয়া এতকাল যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য সামাজিক ভাবেও তাহাদের একটু সম্মান প্রাপ্য আছে, তাহা হইলে অনেক পিতার, অনেক মাতার, অনেক অভি-ভাবকের চখের জল যে গড়াইবেই, ইহার অন্যথা কি করিয়া হইতে পারে? তবু আশাশীল পিতামাতা অদৃশ্য বিধাতার অজ্ঞাত বিধানের

দিকে তাকাইয়া কেবল প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা করেন। বয়স্কা কন্যার মনে আঘাত লাগিতে পারে এমন একটী কথাও বলেন না বা কাহাকেও দিয়া বলান না। মনোভাবকে জোর করিয়া দমন করিয়া রাখার এই যে পরিস্থিতি, ইহা যে পিতামাতার স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও শান্তি কত দ্রুত ও কি সাংঘাতিক ভাবে বিনষ্ট করে, তাহা ওজন করিবার যন্ত্র আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয় নাই।

তুমি মা দুইটী অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে বসিয়া তোমার জীবনের দারুণ পঞ্চতপা সাধিতেছ। একটী আগুন তোমার স্বামী সৃষ্টি করিয়াছেন, অপরটি তোমার কন্যা। কিন্তু মা, জ্বলিবার জন্যই দেহটা রহিয়াছে, মরিলে পরেও ইহাকে আগুনেই জ্বলিতে হইবে। জ্বলাই যখন জীবনের অপরিহার্য্য সর্ত্ত, তখন জ্বলনকে ভয় করিও না। যাহারা আগুনের সৃষ্টি করিয়াছে বা করিতেছে, অন্তরের অপার প্রেমবশে তাহাদের ক্ষমা কর। পরমেশ্বর তাহাদের মঙ্গল করুন।

কোনও কোনও নিরীহ-প্রকৃতির সরল-বুদ্ধি লোক কন্যা দ্বারা বংশের ঐতিহ্য রক্ষার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন এবং কন্যার পিছনে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব-সামর্থ্য, সর্ব্বসহায়তা প্রয়োগ করিয়া দিবস-রজনী আকাশকুসুম রচনা করিতে থাকেন। কিন্তু কন্যা বিবাহিতা হইলে অন্য এক বংশের ঐতিহ্যের চর্চ্চা করিতে বাধ্য হয় এবং কন্যার গর্ভজাত পুত্র নিজ নিজ পিতৃবংশের ধারা-অনুবর্ত্তন করে। আর কন্যা স্বৈরিণী কলঙ্কিনী হইলে একুল ওকুল দুই কুলই তাহার নষ্ট হয় এবং যাহারা তাহার ধারানুবর্ত্তন করে, তাহারা অনেক সময়ে অবাঞ্ছিত বা সমাজবহির্ভূত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়। এই একটী প্রধান কারণে গৃহস্থ মাত্রেই পুত্রসন্তান কামনা করে, কন্যা কামনা করে না। আবার ইহারই ফলে কন্যার বিবাহদান

একটা দায়রূপে পরিগণিত হয়। কন্যা যদি সর্ব্বজনীনভাবে আদরের সামগ্রী হইত, তাহা হইলে বিবাহের বাজারে বর সংগ্রহের জন্য এত দর-কষাকষি করিতে হইত না। তোমাকে যখন কন্যাটী পাত্রস্থা করিতেই হইবে, তখন টাকা নাই এই যুক্তিতে আর টাকা লাগিবে এই আতঙ্কে তুমি পিছু হঠিতে পার না। ভগবানের নাম করিয়া তাল ঠুকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও এবং যে-ভাবে পার কন্যাকে পাত্রস্থা কর। কন্যা তোমার স্নেহের মূল্য বুঝিবে না কিন্তু কন্যার হিতার্থে নিজেকে বলি দেওয়া ছাড়া দরিদ্র পিতামাতার আর কোন্ সদুপায় থাকিতে পারে? পিতামাতার দুঃখ ভাবিয়া স্নেহলতা মরিয়াছিল কিন্তু তোমার কন্যা পিতামাতাকে মারিয়া হইলেও নিজে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে।

* * * *

আজকাল অসবর্ণ বিবাহ, এমনকি আন্তর্জ্জাতিক বিবাহও, চারিদিকে দুই চারিটী করিয়া বেশ চলিতেছে। সমাজে যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে উচ্চতর বর্ণের বলিয়া সমাদৃতা, প্রধানতঃ সেই কন্যাদিগকেই অধিকাধিক সংখ্যায় এই সকল বিবাহের পাত্রী হইতে দেখা যাইতেছে। জাতিভেদ-রূপ দীর্ঘকাল-প্রচলিত একটী প্রথাকে বিনাশ করিবার পক্ষে এইরূপ বিবাহকে একটী সবল পদক্ষেপ বলিয়া গণনা করা হইতেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল বিবাহের দ্বারা জাতিভেদের মূল শিকড়টীর কিছুমাত্র ক্ষতি সাধিত হইতেছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম বিচারের অপেক্ষা রাখে। পোদ, বাগদী, বাউরি, বৈশ্য বা কায়স্থ পাত্র একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কন্যাটী অচিরে শ্বশুরকুলে ও তাহাদের বান্ধব-সমাজে বৌমা, বৌদি ইত্যাদি রূপে পরম সমাদরে গৃহীতা হইলেও, ব্রাহ্মণের ছেলে একটী যোগী, তেলি, সাহা বা পালের কন্যাকে বিবাহ

করিয়া ঘরে তুলিলে বরের বংশের সকল লোকে বা তাহাদের আত্মীয়-কুটুম্বেরা অধিকাংশে এই বধূকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কার্য্যতঃ এইরূপ বিবাহের ফলে একটী মেয়ে স্বকুল-ভ্রষ্টা হইয়া অন্য কুলে মিশিয়াই মাত্র গেল, দুইটী বিভিন্ন পরিবারে বা সমাজে অথবা দুইটী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাব ও আচার-ব্যবহারের আদান-প্রদানের দ্বারা সমগ্র সমাজের যে সর্ব্বাঙ্গীণ লাভের সম্ভাবনা ছিল, সেই প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করিতে সে পারিল না। এইরূপ মিশ্রণে বালিকাটির আত্মত্যাগ সত্যই ঘটিল কিন্তু শ্বশুরবংশে কোনও নূতন অভ্যুন্নতির সূচনা ঘটিল না। কারণ, বিবাহের পরে কন্যা মাত্রই স্বামীর বংশের ঐতিহ্য-ধারায় চলিতে বাধ্য হয়, অশনে, বসনে, আচারে, ব্যবহারে, জীবন-রীতিতে ও চিন্তা-প্রণালীতে সে আর স্বামিকুলের আবহমান কালের তৈরী পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। ইহা এত বড় এক সামাজিক সত্য যে, সমাজ-সংস্কারকামী মহাজনদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে হাজার হাজার অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়া যাইবার পরেও এই অচলায়তনের এককণা প্রস্তরও স্থানচ্যুত হয় নাই। যে কন্যার যেখানেই বিবাহ হউক আর কন্যা যত গুণবতী এবং তেজস্বিনীই হউক না কেন, তাহাকে তাহার নিজস্বতা হারাইতে হইবেই হইবে। ইহা সৃষ্টি-প্রকরণের সাধারণ নিয়ম।

আন্তর্জ্জাতিক বিবাহগুলির পরিণাম আরও চমৎকার। অসবর্ণ বিবাহে কুলভ্রষ্টতাই চরম শাস্তি কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিবাহে স্বজাতি-ভ্রষ্টতাও অতিরিক্ত এক পরম প্রাপ্য। চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, ইহাদের বংশধরেরা পুরাতন কুলে আসিয়া ঠাঁই পাইবার জন্য কত আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে, কেহ কেহ চারি পাঁচ পুরুষের নষ্ট

কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া চ্যাটার্জ্জি, ব্যানার্জ্জি, মুখার্জ্জি সাজিতেছে, পুনরায় স্বজাতির কোলে আসিয়া তুচ্ছ একটু ঠাঁই পাইলে ইহারা ধন্য হইয়া যায়।

কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহা বলিতে চাহিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ সামর্থ্যের মধ্যে আছে, নিজ বংশের সমতুল বংশে কন্যাকে সম্প্রদানের চেষ্টা করিবে। দুই-ভাষাভাষী পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক আত্মীয়তা হইলে অনেক সময়ে সেই সকল সমস্যাই দেখা দেয়, যে সকল সমস্যার বিবরণ উপরে লিখিয়াছি। চেষ্টা কর কন্যাকে ভাল পাত্রে দিতে, তার পরেরটা ভগবান দেখিবেন। বংশানুক্রমে মানব-জাতির দ্রুত উন্নতি ঘটিবে, আজকার সাধারণ মানুষ পুরুষানুক্রমিক সাধনার ফলে, কালিকার দিব্য মানবে পরিণত হইবে,—যাবতীয় বিবাহ সংঘটনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে, মাত্র এই একটী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

রাজগীর (পাটনা)

৩০শে ভাদ্র, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্নীবিয়োগের পর প্রত্যেক পুরুষেরই এমন সতর্ক ভাবে চলা সঙ্গত, যাহাতে অতিরিক্ত-ঘনিষ্ঠতা-নিবন্ধন অন্য কোনও নারীতে মনের

অজ্ঞাতসারে হঠাৎ অত্যধিক আকর্ষণ না আসিয়া যায়। স্ত্রী যখন জীবিত ছিল, তখন তাহাকে নিয়া নানা সময়ে তোমার মনে নানা রূপ প্রেম-সোহাগ-মিশ্রিত ভাবের উদয় হইত। স্ত্রীর দেহটী শ্মশানে ছাই করিয়া দিয়া আসিবার পরেও তোমার মনে সেই ভাবগুলি বেশ সজাগ, সতেজ ও টাটকা রহিয়া গিয়াছে। অন্য কোনও নারীর সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বা অসতর্ক নৈকট্য স্থাপন করিতে গেলে হঠাৎ যদি সেই পূর্ব্ব ভাবগুলির আবেশ তোমাতে আসিয়া যায়, তাহা হইলে অবিবেকী মন তোমাকে অনেক নীচে নামাইয়া দিতে পারে। এই জন্যই সদ্যঃস্ত্রীবিয়োগের পরে বৎসরেক কাল অতীব কঠোরতার সহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আবশ্যকতা সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হয়। ইহা সত্যই প্রয়োজন, ইহা সত্যই লাভজনক। স্বামী মরিবার পরে স্ত্রীর জন্য যে সকল কঠোর বিধান রহিয়াছে, স্ত্রী মারা যাইবার পরে স্বামীর জন্য কেন সেইরূপ বিধান থাকিবে না, ইহা আমি বুঝিতে পারি না।

পত্নীবিয়োগের পর হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন অতীব সঙ্গত ব্যবস্থা। ইচ্ছাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়চালন না করা তোমার কর্ত্তব্য হইবে। অতীত সম্ভোগের বিষয়ে চিন্তা বা চর্চ্চা না করা তোমার কর্ত্তব্য হইবে। যাহাদের সংস্রবে গেলে কামচিন্তার প্রশ্রয় বা উদ্রেক হইতে পারে, তাহাদের কাছ হইতে যত্নতঃ দূরে থাকিবার চেষ্টা তোমার কর্ত্তব্য হইবে। আসক্তি নামক বস্তুটা এমনই অসাধারণ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে যে, অধিকাংশ সময়েই তাহাকে চিনিয়া ওঠা যায় না। একটী সুন্দর শিশুর প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ যে অনেক সময়ে তাহার মাতার প্রতি প্রচ্ছন্ন লালসা হইতে উৎপন্ন, একটী দরিদ্র বালকের প্রতি অনুকম্পা যে তাহার ভগিনীর প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের প্রতিরূপ মাত্র, একথা কয় জনে

যথাযোগ্য কালে ধরিতে পারে? যথন প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়িয়া যায়, তখন হয়ত প্রতিষেধের পথ থাকে না, প্রতীকারের পথও অনেক দূরে সরিয়া যায়। স্ত্রীবিয়োগে আতুর চিত্ত বড়ই একটা দুর্বল স্থান, সুযোগ-সন্ধানী নারীরা যেথানে অতি সহজে থাবল বসাইতে বা ছোবল মারিতে সমর্থ হয়।

কথাগুলি তোমাকে আতঙ্কিত করিবার জন্য লিখিতেছি না, লিখিতেছি শুধু সাবধান করিয়া দিবার জন্য। আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির এই জগতে শান্তি নাই আর স্ত্রীলোক থাকিবে না, ভূমণ্ডলে এমন স্থানও নাই। সুতরাং সংসারে বিচরণ করিতে হইলে অমিত সাহস লইয়া চলিতে হইবে কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে দুঃসাহস কদাপি ভাল নহে। বাহিরে দেখিতে যাহাকে যেমনই মনে হউক, কোন্ রমণীর ভিতরের খবর তুমি জান? ইহা জানা যেমন যায় না, জানিবার চেষ্টাও এক প্রকারের বাতুলতা। নিতান্ত প্রগল্‌ভ-স্বভাবা নারীও সহজে নিজেকে ধরা দেয় না, দিতে পারে না, সহজে ধরা দিয়া ফেলিলে তাহার চরিত্রের রহস্যময়ী আকর্ষণীয়তা নিমেষে শূন্যে মিলাইয়া যায়! আর, খাইয়া দাইয়া তোমার আর কোনও কাজ থাকিবে না, তুমি কেবল নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের মতন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে নারীদের মনের অঙ্গন অতিক্রম করিতে থাকিবে, ইহা কোনও সুখকর বা স্বস্তিকর অবস্থাও নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্যোবিধবা নারীরা যেমন করিয়া হঠাৎ অতিমাত্রায় সতর্ক হইয়া যায় এবং চারিদিকের অপ্রত্যাশিত সহানুভূতিগুলিকে ওজন করিয়া করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে এবং প্রাণপণে সতর্ক থাকে যেন হঠাৎ কোনও ভুল করিয়া না বসে, তোমার পক্ষেও তাহাই কর্ত্তব্য হইবে। স্ত্রীর মৃত্যুতে তুমি

অতিমাত্রায় শোকাকুল হও নাই, একথা সত্য হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তোমার স্নেহ-সোহাগের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যাইতে পারে না । ঐ স্মৃতির পুনঃ পুনঃ রোমন্থন তোমাকে অন্য নারীতে আসক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। অন্তরের সোহাগ ঠিক ঠিকই রহিয়া গেল, কেবল নারীটী সরিয়া গেল, একটীর স্থানে আর একটী আসিয়া বসিয়া পড়িল। প্রথম প্রথম তোমার মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বা বেমানান-বোধ আসিতে পারে, পরে সবই ঠিক ঠিক মিলজুল হইয়া গেল। ইহাই বহুজনের জীবনের বাস্তব ঘটনা।

স্বামী মরিলে উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত নেয়। সমাজ-সংস্কারকেরা অনেক বলিয়া, কহিয়া, বুঝ-প্রবোধ দিয়াও ইহার অন্যথা করিতে পারেন নাই। এই একটী ব্যাপার যে সমগ্র হিন্দু-সমাজের মূল সূত্রটীকে কত শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। উচ্চতম কুলের ব্রাহ্মণ বালকও ঐ বিধবাদের জীবনের কঠোরতার দৃষ্টান্ত হইতে নিজ আদর্শের সন্ধান নিজের অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে। জাতিভেদ-প্রথাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য সমাজ-সংস্কারের স্তরে এতদিন অনেক আন্দোলন হইয়াছে, সম্প্রতি মনে হয়, রাষ্ট্রিক আইন-কানুনের স্তরেও সেইরূপ চেষ্টা হইবে। কিন্তু সংযম-সদাচারের যে আদর্শ বা মান পুণ্যশীলা বিধবারা নিজ নিজ জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে যতদিন না ভাঙ্গন ধরান যাইবে, ততদিন ঐ সকল চেষ্টার সফলতার আশা খুবই কম। যতদিন ভারতবর্ষে একটী মাত্রও সদাচারশীলা বিধবা জীবিত থাকিবেন, ততদিন সংযম, পবিত্রতা, কৃচ্ছ্র ও তপস্যার এই দৃষ্টান্তের সুফল উচ্চসম্মানাভিলাষী ব্রাহ্মণের মন হইতে অপসৃত হইবে না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একটী মাত্রও

সদাচারী ব্রাহ্মণ স্বকীয় ত্যাগ, সংযম, নির্লোভতা ও নিষ্ঠা নিয়া পর-প্রত্যাশাহীন পবিত্র জীবন যাপন করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে জনসাধারণের অন্তরের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এবং ইহাই যদি হয়, তবে জাতিভেদের ধ্বংস হইবে কি করিয়া, ইহাই এক ভাবনার কথাই হইয়াছে।

জাতিভেদ ভাল না মন্দ, এই কথা নিয়া আমি কখনও মাথা ঘামাই নাই। সদাচার ভাল, সংযম ভাল, সর্ব্বমানবে সমদৃষ্টি ভাল, ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ পথটীতে প্রত্যেককে অধিকার দান ভাল, আমি মাত্র এই কথাই বলিয়াছি। ইহার ফলে জাতিভেদ থাকে থাকুক, যায় যাউক। সকলকে কদাচারী শূদ্রে পরিণত করিয়া যে জাতিভেদ-বিলোপ, তাহা মানুষের মনুষ্যত্বের মান উন্নীত করিবে না। অধিকাংশকে সদাচারী করিয়া ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়া যে জাতিভেদ-বিলোপ, তাহা মানুষমাত্রেরই মনুষ্যত্বের মান উন্নয়িত করিবে। সেই ব্রাহ্মণ তার সংযম-ব্রতের মহিমায় হইবে বরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই তোমার এখন দেহে মনে সর্ব্বতোভাবে সংযমের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গয়া

১৪ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৭৯

(১-১০-৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তেমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়' অস্ত্রোপচার করিয়া দিল এখন তুমি আফশোষ করিতেছ। ইহা এক বিচিত্র অবস্থা। মন নীতিভ্রষ্ট হইলে বিপথকে সুপথ বলিয়া ভ্রম হয়। অনেক নামী ও দামী লোকদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়া সময় নষ্ট করা ভুল মনে করি।

ঋণ করিয়া যখন বাড়ী করিয়াছ, আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ঋণটী শোধ করিয়া ফেল। ঋণের বোঝা মাথা হইতে নামিয়া গেলে দেখিবে, কত শান্তি, কত তৃপ্তি। তখন গৃহ তোমার আনন্দ-মুখরিত হইবে। ঋণ-শোধ করার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ কর। দেখিবে, ঋণমুক্ত হইবার অনুকূল পরিস্থিতি আচম্বিতে সৃষ্ট হইয়া যাইবে।

তোমাদের স্থানীয় গুরুভাইবোনেরা অধিকাংশই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আসিতে রুচি বোধ করে না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ঠিক এই কারণ-বশতই গত সাত আট বৎসরে তোমাদের সহরটায় যাইবার ভ্রমণ-তালিকা করিতে আমি আগ্রহ বোধ করি নাই। ভবিষ্যতে যদি হঠাৎ তোমাদের ওখানে যাওয়া হয়, দীক্ষার্থীর ভিড় ত অবশ্যম্ভাবী কিন্তু যাহারা দীক্ষালাভের পরে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাকে অবহেলা করিবে বলিয়া মনে করিবে, তাহাদিগকে দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করিতে দিও না। এই বিষয়ে তোমাদের দৃঢ় হইতে হইবে।

সকলে একত্র উপাসনায় বসিবার অভ্যাসটীর প্রকৃত শুভফল অসাধারণ। কিছুকাল ইহার অনুশীলন ছাড়া ত এই ফলের আস্বাদন লাভ সম্ভব নহে। যাহারা বেয়াড়া ও নিতান্ত অনাগ্রহী, তাহাদের বাদ দিয়াই তোমরা তোমাদের সমবেত উপাসনা নিষ্ঠাপূর্ব্বক চালাইয়া যাও। কেহ ধনগর্ব্বে, কেহ বিদ্যাবত্তার দম্ভে, কেহ ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য্য হেতু

সমবেত উপাসনাকে অবহেলা করিলে, তাহার প্রতি রুষ্ট হইও না, —উদাসীন হইও। সকলকেই স্নেহভরে ডাকিও, না আসিলে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করিও না। সে তাহার নিজের কুশলকে স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া চলিলে তুমি জোর করিয়া তাহার কোন্ কুশল সম্পাদন করিবে? সমবেত উপাসনা ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, জানিবে, ইহা কুশলেরই খনি, অমৃতেরই উৎস।

সকলে সমবেত উপাসনায় বসিয়া গেলে আমিও যে তাহাদের সমসাধক রূপে আমার নির্দ্ধারিত আসনটীতে বসিয়া যাই, এ-কথাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিবার পক্ষে তোমাদের অনেকেরই কোনও বাধা নাই। কারণ, তোমরা অনেকে সমবেত উপাসনার সময়ে আমার কণ্ঠস্বর অবিকৃত ভাবে শুনিয়াছ। তোমরা এই বিশ্বাসটীকে দিনের পর দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া চলিতে থাক। অসংখ্য গুরুদেবদের ন্যায় আমি তোমাদের পূজা পাইতে চাহি না, আমি চাহি তোমরা প্রত্যেকে জগতের কল্যাণ কাজে লাগো। এই জন্যই আমি তোমাদের পূজ্য বিগ্রহ না হইয়া সমবেত-উপাসনা-কালে তোমাদের সমসাধক হইয়াছি। ইহার মধ্যে আছে আমার অন্তরের অকপট সরলতা, আমি বুজরুকীর সমর্থক নহি।

* * * *

পুত্রকন্যাদের মনে প্রতিজনে অখণ্ড-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার সৃষ্টি কর। পিতা বা মাতাতেই অখণ্ড-আদর্শ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে আর পুত্র-পৌত্রেরা ভিন্ন ভাবে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইতে থাকিবে, ইহা অখণ্ড-আদর্শের সহিত সঙ্গতিহীন। তিন পুরুষ তথা নয় পুরুষ ব্যাপিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট ধ্যানের অনুশীলন, একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অনুবর্ত্তন ব্যতীত মানব-গোষ্ঠীর আত্যন্তিক বিবর্ত্তন কদাচ সম্ভব নহে। কেবল

নসীব বা ভবিতব্যের উপরে নির্ভরশীল হইও না। হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, বিলাতি ইন্দুর প্রভৃতির উপরে সৌজাত্যতত্ত্বের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবাধে চলিয়াছে, মানুষের উপরে কি তাহার প্রয়োজন নাই? জাতি হিসাবে মানুষ মোটেই উন্নত হইবে না আর তাহাদের ইন্দ্রিয়াতুর মনের তৃপ্তি-সাধনের জন্য হাঁস আর মুরগীরাই উন্নততর হইতে থাকিবে, ইহা কি এক বিষম প্রহেলিকা নহে? প্রাধান্যের গৌরবাধিকারী অনেককেই ত বলিতে শুনিতেছি,—"ছেলেমেয়েরা আগে বড় হউক, তারপরে তারা নিজ নিজ সাধন-পন্থা বাছিয়া লইবে।" ইহা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সেই ক্ষেত্রে সত্যই মারাত্মক, যে ক্ষেত্রে অখণ্ড আদর্শ স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিতেছে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সাধনা পুরুষানুক্রমিক সংবর্দ্ধনার মধ্য দিয়া যে নবায়ন সৃষ্টি করিবে, অভিনব মানব-জাতির পুণ্যাবির্ভাব তাহারই প্রসাদে ঘটিবে, অন্যভাবে তাহা সম্ভব নহে। আমাকে যাহারা প্রবল পরাক্রমে পাথর ভাঙ্গিতে আর গাইত মারিতে দেখিতেছে, তাহারা আমার মূর্ত্তি বা স্বরূপের কিছুই এখনো দেখে নাই। এই জন্যই তাহারা আমার অধিকাংশ উপদেশ বা নির্দ্দেশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না।

তোমাদের মধ্যে যাহারা দীক্ষার বয়সে প্রবীণ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কেন তাহারা স্থবিরের মত রহিয়াছে? প্রবীণ হইলেই স্থবির হইতে হইবে কেন? আমি ত বয়সে প্রবীণ কিন্তু আমার যৌবন কি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে? প্রবীণদিগকে সর্ব্বকার্য্যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে অনুরোধ কর। নবীনেরা অনেক সময়ে প্রবীণদের ভ্রান্ত পদক্ষেপের অনুবর্ত্তন করে। ইহা নবীনদের দোষ নহে, ইহা প্রবীণদেরই দায়িত্ব। নবীন ও প্রবীণদের মাঝে মাঝে পরামর্শের জন্য একত্র বসা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য হইবে, জগন্নাথের রথের গতি বাড়াইবার জন্য কি করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর সংখ্যায় লোককে রথের দড়িতে হাত লাগাইতে প্রণোদিত করা যায়। প্রণোদনা মানে প্ররোচনা নহে, প্রণোদনার মানে প্রেরণা প্রদান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

রাজগীর (পাটনা)

১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৭৯

(৩-১০-৭২ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ নিও।

তোমার ১লা আষাঢ়ের পত্রখানা অদ্য পূর্ণ আড়াই মাস পরে হস্তগত হইল। পত্র, পত্রদাতা বা ডাকপিয়ন প্রভৃতি কাহারই দোষ নাই, দোষ হইতেছে পত্রাধিক্যের। এত পত্র আসিলে পড়িবেই বা কে, উত্তরই বা দিবে কেমনে? ইতিমধ্যে তোমার গৃহে আকস্মিক দুর্ঘটনাটী ঘটিয়া গেল। আমি তোমাদের দুঃখে সমদুঃখী জানিও। ধ্রুব-প্রহ্লাদের দেশে পুনরায় শিশুরা দৈবী সম্পদ নিয়া জন্ম নিতে সুরু করিবে, ইহাই আমার প্রত্যাশা। কিন্তু পিতামাতার দেহ ও মন তদ্রূপ ভাবে গঠিত হইবে, তবে ত! নিয়ত অনুধ্যানের দ্বারা মনকে তুমি নিশ্চিতই আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতে পার কিন্তু দেহের গঠনটী তুমি একার চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত করিতে পার না। নির্দ্দিষ্ট রকমের একটী দেহ পাইবার জন্য তোমাকে

তোমার পিতার, পিতামহের ও প্রপিতামহাদির কাছে ঋণী হইতে হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট ধাতের আর একটী দেহ পাইবার জন্য তোমার সহধর্ম্মিণীকেও তাহার পিতার, পিতামহের এবং প্রপিতামহাদির কাছে ঋণী হইতে হইয়াছে। এস্থলে পিতা বলিতে পিতামাতা, পিতামহ বলিতে পিতামহ ও পিতামহী, প্রপিতামহ বলিতে প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী উভয়কেই বুঝাইতেছে। সেই ঋণ আবার তোমাদের পুত্র-কন্যায় গিয়া বর্ত্তাইতেছে। এই ঋণ শুধু ঋণ নহে, ইহা প্রত্যেকের জীবনের প্রধান মূলধন। ভাবিয়া দেখ, নিজ দেহটীর গঠনটুকুর জন্য শিশুটীকে কত জনের কাছ হইতে কতখানি করিয়া কত বস্তু এবং অবস্তু নিজের একেবারেই অজ্ঞাতসারে নিতে হইয়াছে। সুতরাং শিশু জন্মিবার পর হইতে কেবলই রোগে ভুগিল এবং যোগ্য ভাবে যুদ্ধ দিতে অক্ষম হইয়া অকালে প্রাণবিসর্জ্জন দিল, এটা কত বড় একটা বিমিশ্র ব্যাপার। প্রত্যেকটী শিশুর সুদীর্ঘজীবিতার কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা পাইবেন তার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে, প্রত্যেকটী শিশুর অকালবিয়োগের জন্য সকল দায়িত্ব প্রধানত তার পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদের,— একথা মোটামুটি ভাবে সত্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং তোমাদের পরবর্ত্তী সন্তান যাহাতে অকালমৃত্যুর বিধিলিপি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে বাধ্য আর না হয়; তাহার দিকে তীব্র, তীক্ষ্ণ, একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া তোমরা দুই জনে চল বাবা।

স্বামী ও পত্নীর মৈথুন-মিলনকে ভগবৎস্মরণাশ্রিত করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে দম্পতীর প্রেমানুশীলন রূপ মনোধর্ম্ম আহত হয় বলিয়া যৌন-মনস্তত্ত্ববিশারদেরা যাহা বলেন, তাহার ভিতরে সত্য-মিথ্যা কতটুকু আছে, তদ্বিষয়ে একটী মন্তব্য প্রদানের মতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও আমার নাই।

কিন্তু যে জন প্রকৃতই ভগবৎ-প্রেমিক, তাহার ব্যক্তিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম বা লোকাচারের অনুবর্ত্তনের ভিতরেও যে ঈশ্বরীয় প্রেমের অনিন্দ্য আস্বাদন প্রধান ও প্রথমস্থানীয়, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু দেখি না। জননক্রিয়ায় রত থাকিয়াও এইরূপ ভক্তেরা পরমেশ্বরকে অবিস্মরণীয় পরমবস্তু জানিয়া প্রতিটি স্পন্দনে তাঁহার সুমধুর নামরসের সুগভীর আস্বাদন লাভ করিয়া থাকেন। তোমার লিখিত পত্রের কয়েকটী পংক্তির সরল উক্তি হইতে আমি তাহারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি ঘটনাকে,—তাহা কেহ দেখুক আর না দেখুক, জানুক আর না জানুক,—পরমেশ্বর-চরণাশ্রিত করিয়া চলিবার চেষ্টা কর বাবা। ঐহিক উন্নতি ইহার ফলে ঘটুক আর না ঘটুক, অন্তরের নিবিড় গহনে, হৃদয়ের অতল গভীরে শান্তির সুশীতল শিহরণ নিয়ত উপলব্ধিতে পাইয়া জন্মজীবন নিশ্চিত সফল করিতে পারিবে।

তোমাদের উভয়ের শরীরগত যে সকল অপূর্ণতা আছে, তাহা সুচিকিৎসার দ্বারা এবং জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প সহায়ে পরিভ্রমণ-প্রক্রিয়ার অনুশীলনের দ্বারা দূর কর।

পরবর্ত্তী সন্তানটী যাহাতে অকালে না আসে এবং আসিয়া যেন যাহাতে আবার অকালে না চলিয়া যায়, তাহার জন্য দেহের দিক দিয়া, মনের দিক দিয়া, রুচির দিক দিয়া, সাধনার দিক দিয়া যাহা যাহা করণীয়, তাহা উভয়ে একমনে একপ্রাণে করিয়া যাইতে থাক। হঠাৎ সন্তান লাভ কোনও কাজের কথা নহে। দীর্ঘায়ু, তপস্বী, পরকল্যাণব্রত, সুধন্য সন্তান লাভের জন্য তপস্যায় রত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

রাজগীর

১৭ আশ্বিন, বুধবার ১৩৭৯

(৪-১০-৭২ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকল সময়ে মনকে উদ্বেগমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা এমন সতর্কতার সহিত চলিও যাহাতে মিথ্যার সহিত মিতালী করিতে না হয় এবং মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইয়া না পড়। মামলা-মোকদ্দমার অনেক দোষ। সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, সম্পূর্ণ সত্য পথে থাকিলে মামলাতে জিতিবার আশা সুদূরপরাহত। উকিলেরা মক্কেলকে মামলা-মোকদ্দমায় জিতিতে নানা ভাবে সাহায্য করেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্ব কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহারা এমন পন্থাও প্রদর্শন করেন, যাহার পরিণতি নরকবাসে। আইন-আদালত এমনই বিশ্রী ব্যাপার যে, পদে পদে বিবেককে লাঞ্ছিত না করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। নিতান্ত না ঠেকিলে ঐ পথে পা বাড়াইও না।

অদৃষ্টের তাড়নায় বহু লাঞ্ছনা সহিয়াছ কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িও না। ভগবানের মঙ্গলমধুময় নামে বিশ্বাস রাখ এবং নির্ভয়ে পথ চল। নাম ছাড়িও না, নাম করিতে করিতে তোমার যাবতীয় নষ্ট সম্পদের পুনরুদ্ধার ঘটিবে। কাহারও অহিত চিন্তা করিও না, কাহাকেও তোমার অহিত করিতে দিও না। দৃঢ় থাক এবং ভগবানের নাম করিতে করিতে নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্য অনুধাবন করিতে সমর্থ হও।

ধর্ম্মপত্নীকে তোমার প্রতিটি সচ্চিন্তার সহকারিণী করিয়া লও। তাহাকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না। তাহার সহায়তা এবং পৃষ্ঠ-

পোষকতা তোমার প্রতি পদক্ষেপেই একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তির উৎস রূপে পরিণত কর। তাহা করিতে হইলেই তাহার মধ্যে তোমাকে জগন্মাতাকে দর্শন করিতে হইবে। মন একটু শুচিশুদ্ধ হইলেই ইহা তোমার পক্ষে অতীব সহজ কাজ হইয়া যাইবে।

ছেলেমেয়েদের চরিত্র-গঠনের দিকে প্রখর দৃষ্টি দাও। তুমি যে যে বস্তুকে, যে যে তত্ত্বকে, যে যে সত্যকে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় বলিয়া বুঝিয়াছ, সেই সেই বস্তু, সেই সেই তত্ত্ব ও সেই সেই সত্য সম্পর্কে পুত্রকন্যাদের মনে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও নিষ্ঠা সৃষ্টির দিকে মন দাও। কোনো কোনো পিতামাতাকে বলিতে শুনিতেছি,—"ছেলেমেয়েরা বড় হইলে নিজ নিজ অভিরুচিমত পন্থা স্বাধীন বিচারে নির্ব্বাচন করিয়া লইবে",—কিন্তু একথা প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাইবার সামিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। অন্যেরা এই ভুল করিতেছে বলিয়া তুমিও সঙ্গে সঙ্গে এই ভুলটী করিয়া বসিও না।

বালক-বালিকাদিগকে চরিত্র-গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করিয়া দিতে হইবে। এই জন্য তোমাদের মধ্যে যে কয়জন আছ সমসাধক, তাহাদের উচিত নিজেদের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহৃদ্যের সৃষ্টি করা, পরস্পরের আচরণে সদ্‌দৃষ্টান্তের শুভফল প্রতিফলিত করা, সত্যাচারী ও সততাসম্পন্ন হওয়া। এই একটী কাজ যদি করিতে পার, তবে জানিও, দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট কাজ তোমরা করিলে। তোমরা ওখানে সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প আছ বলিয়াই তোমরা তুচ্ছ নহ। তোমাদের ঐ অল্প কয়টী লোকের মধ্যে যদি মৈত্রী, প্রীতি, একতা ও সততা নিয়ত বিরাজ করে, তবে তোমরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে

দিয়াই দেশের ও দশের অতীব বৃহৎ সেবা-সমূহের সূত্রপাত করিয়া দিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

রাজগীর

১৭ আশ্বিন, ১৩৭৯

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১৪ শ্রাবণের পত্র পাইলাম। ঋণের জালায় অধীর হইয়াছ। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইতে চাহ। না বাবা, আত্মহত্যা তোমাকে করিতে হইবে না, ঋণও তোমার শোধ হইয়া যাইবে। ধৈর্য্য ধারণ কর। একটা একটা করিয়া সবগুলি ঋণের তালিকা তৈরী কর। তারপরে ছোট ছোট ধরিয়া একটা একটা করিয়া ঋণ আধপেটা খাইয়া হইলেও শোধ করিতে সুরু কর। ছোট ঋণটাকে যে জিদ করিয়া শোধ করিয়া দেয়, ক্রমে ক্রমে তার বড় ঋণটা শোধ করিবার সাহস এবং শক্তি আসে। ইহা অবধারিত সত্য। ঋণ শোধ করা আর রাজ্যজয় করা প্রায় সমান কথা। রাজ্যজয় করিতে হইলে সাধারণতঃ প্রথমে গ্রাম জয় করিতে হয়, তারপরে জয় করিতে হয় পরগণা, সর্ব্বশেষে আক্রমণ করিতে হয় রাজধানী। অবশ্য, ইহাই যুদ্ধজয়ের সাধারণ রীতি। হ্যানিবল অবশ্য এইরূপ না করিয়া যদি প্রথমেই রাজধানী রোম শহরটা

আক্রমণ করিতেন, তবে জগজ্জয়ী হইতেন কিন্তু ছোটকে আগে পদতলে আনিয়াই আস্তে আস্তে বড়কে কাবু করিতে হয়। তুমি আগে পাঁচ সিকা আর দেড় টাকার দেনাগুলি অবিচলিত বিক্রমে শোধ করিয়া ফেলিয়া অন্তরে দুর্জ্জয় সাহস সঞ্চয় কর।

হিন্দুদের চিরকালের ধর্ম্মবিশ্বাস বলে যে, ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করিলেও সেই ঋণের দায় হইতে উদ্ধার নাই, হয় তোমার অধস্তন বংশধরেরা তাহা শোধ করিতে বাধ্য হইবে, নয় তোমাকে পরের জন্মে অন্য কলেবর ধারণ করিয়া পাওনাদারের পাওনা মিটাইতে হইবে। এই সংস্কার হিন্দুর মনে এমন বদ্ধমূল যে, চার্ব্বাক মুনি অনেক করিয়া উপদেশ দিলেন,—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ',— অর্থাৎ যতকাল বাঁচিবে, সুখেই বাঁচ, ঋণ করিয়া ঘৃত খাও"—তবু কেহ সেই কথায় কাণ দিতে পারিল না। চার্ব্বাক পুনঃ পুনঃ বলিলেন,— "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ—দেহ শ্মশানে ছাই হইয়া গেলে তা কি আর আসে?"—তবু কেহ সে কথা শুনিল না। সুতরাং আত্মহত্যা করিয়াই বা ঋণের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছ কোথায়?

সুতরাং সাহস করিয়া ঋণগুলি শোধের চেষ্টায়ই তোমাকে নামিতে হইবে। এমনকি, প্রয়োজন স্থলে দুঃসাহসও করিতে হইবে।

অবশ্য, এমন কতকগুলি ঋণ আছে, যাহা হয়ত প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণ নহে কিন্তু প্রথার অত্যাচারে এগুলি ঋণ হইয়া অজগর সর্পের মত অধমর্ণকে দিনের পর দিন গ্রাস করিতেছে। জনমতের চাপে সেই সকল ঋণকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা আস্তে আস্তে আইন তোমাকে দান করিবে। তাহার জন্য গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন আছে, কোনো কোনো দেশে তাহার জন্য রক্তাক্ত বিপ্লবও ঘটিয়া গিয়াছে। খুব

সম্ভবতঃ তোমার ঋণগুলি সেই শ্রেণীর নহে। তাহা হইলে তোমাকে ঋণ ত নিশ্চয়ই শোধ দিতে হইবে। ঋণ-শোধ না দেওয়াকে যদি সঙ্গত কার্য্য বলিয়া মনে করিতে যাই, তাহা হইলে লোকের প্রয়োজনের সময়ে কেহ কাহাকেও ঋণ দিবে না, ধারে জিনিষ বেচিবে না, নগদ টাকা ছাড়া স্থায়ী গ্রাহককেও হোটেলে খাইতে দিবে না। উহা কি এক অবাঞ্ছনীয় অবস্থা নহে?

অনুমান হইতেছে যে, তোমার ধারদেনার সমুদ্রটীর সৃষ্টি হইয়াছে তোমার ব্যবসায়ের অনভিজ্ঞতার দরুণ। স্বাধীন ব্যবসায় করিতে গেলেই যদি ঋণ বাড়ে, তাহা হইলে কতকদিন কোনও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর ভৃত্যরূপে কাজ করিয়া জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন কর। তারপরে যৎ-সামান্য মূলধন নিয়া কাজ-কারবার নূতন করিয়া সুরু কর এবং প্রতিজ্ঞা কর যে, মূলধন ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিবে না। এভাবে কিছুকাল করিবার পরে দেখিবে যে, তোমার সততা ও সংগ্রামের শক্তি তোমাকে দুর্জ্জেয় করিয়া তুলিয়াছে। তখন তুমি জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

রাজগীর

১৭ আশ্বিন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় ভগবানের নাম স্মরণে রাখিবে। ইহাতে মনে থাকিবে শান্তি, প্রাণে জাগিবে আনন্দ, জগদ্বাসী সকলের প্রতি উপজিবে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ নির্ম্মল প্রেম।

নামের সেবা তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যে অটুট প্রতিষ্ঠা দিবে। নামের বলে তোমার আত্মসংযমের ক্ষমতা ও চরিত্রের ধৈর্য্য বাড়িবে। নাম তোমার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত করিবে। নাম তোমার সঙ্কল্পকে অটল করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যকে যদি অটুট করিতে পার, লোকে তোমার কথা বেদবাক্যের মত শ্রদ্ধা নিয়া শুনিবে ও মানিবে। ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রচার করিয়া তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করিতে পারে। যে-ই যাহা বলুক, তোমরা প্রতিজনে সাধ্যমত ইন্দ্রিয়-সংযমী হও। সংযমই বলের উৎস। যার যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, তার ততটুকু বল, একথা বিশ্বাস করিও। মনের শক্তি, আত্মার শক্তি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় স্বপ্রকাশ হয়। আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যকে পরম মূল্যবান্ বলিয়া জানিয়াছি। তোমরা আমার শিষ্যকুলও ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের প্রধান সোপান বলিয়া স্বীকার করিও। শুধু কথায় নহে, কাজেও তাহার প্রমাণ দিও।

অনেক ধর্ম্মসঙ্ঘ নিজ নিজ গুরুর পূজা-প্রবর্ত্তনের প্রয়াসে অশেষ শ্রম করিতেছেন। তোমাদের উহা পথ নহে। আমি তোমাদের কাছে আমার পূজা চাহি না, আমি চাহি তোমরা সর্ব্বলোকহিতার্থে ত্যাগ, সেবা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন কর। আমার মহিমা-প্রচার যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়,—তোমাদের লক্ষ্য হইবে আমার আদর্শ-প্রচার, যে আদর্শের দুইটী চরণের মধ্যে একটী হইতেছে অভিক্ষা, স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তি, অপরটী হইতেছে চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা-নিবারণ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য

নিজেরাও হুজুগে আকৃষ্ট হইও না, অপরকেও হুজুগের দ্বারা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিও না। সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়া তোমরা ছোট-বড় প্রত্যেকটী কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবে এবং যার যার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সৎ-পরামর্শ দিবার জন্য নবীন ও প্রবীণ, তরুণ ও প্রাচীন, স্ত্রীলোক ও পুরুষ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সতীর্থকে সাদরে ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

রাজগীর

১৭ আশ্বিন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা নিবার পরদিন হইতেই তুমি তোমার গুরুদত্ত আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠামূলক আদর্শের পতাকা সবলে ধরিয়া রাখিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দের পারাপার নাই। একনিষ্ঠ আদর্শবাদ তোমার মনে দিক্ শান্তি, জাতির বুকে দিক্ বল আর জগদ্বাসীর প্রাণে দিক্ অনাবিল আনন্দ। কেহ যে আমাদের পর নহে, এই কথাটী আমরা কেহ কদাচ যেন না ভুলি।

সংসারের অভাব-অনটন তোমাকে ক্লেশ দিতেছে জানিয়া ব্যথিত হইলাম। দারিদ্র্যকে দূর করিবার একমাত্র উপায় পদ্ধতিবদ্ধ, সুপরিকল্পিত, কঠোর পরিশ্রম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকুক এবং দীর্ঘায়ু লাভ কর। মনের দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিয়া সাহস-সহকারে

দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ কর। হতাশ কখনো হইও না, নিজেকে দুর্ব্বল বা অক্ষম বলিয়াও কখনো ভাবিও না। জীবনে ছোটবড় যে সকল পুণ্য কর্ম্ম করিয়া আমাদের সকলের তুমি প্রিয় হইয়াছ, সেই পুণ্যগুলি তোমাকে চারিদিক দিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গের মতন রক্ষা করিবে।

সময় মতন খাইতে ও ঘুমাইতে চেষ্টা করিও। যে কাজ নিজের চোখের উপরে করান চলে, তেমন কাজের ভার অন্যের উপরে দিয়া দূরে যাইও না। সকলকে বিশ্বাস করিও কিন্তু সতর্কতার দিক্ দিয়া নিজের কোনও ত্রুটি রাখিও না। অতিরিক্ত পর-নির্ভরতা অনেক সৎ-কর্ম্মের ক্ষতি-সাধন করিয়া থাকে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

রাজগীর

হরিওঁ

১৭ আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে শরণার্থীরা যখন জীবনের আশা-ভরসা সব ত্যাগ করিয়া ভারতের নীল আকাশের নীচে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিল, তখন তোমরা শিবিরে শিবিরে গিয়া যে প্রশংসনীয় প্রচার ও সংগঠন-কার্য্য নির্ভীক মনে ও উদার প্রাণে করিয়া যাইতেছিলে, আজ পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবার পরেও ঠিক সেইরূপ কাজ তোমাদের স্বদেশবাসী নরনারীদের মধ্যে করিবার প্রয়োজন

ফুরাইয়া যায় নাই। সেই কাজ এখনও তোমাদের করিতে হইবে। এ কাজ মানুষের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগাইবার কাজ, এ কাজ মানুষের পশুভাবকে উপসংহৃত করিয়া দেবভাবের উদ্দীপনা দানের কাজ। একাজ মহৎ, একাজ বৃহৎ, একাজ গৌরবজনক। তোমরা কি হঠাৎ কিছুদিন বেশ কাজ করিয়া হঠাৎ দম লইবার জন্য একটুকু থামিয়াছ, নাকি কাজ একেবারে ছাড়িয়াই দিলে? খবরটা আমাকে অবশ্যই জানাইও।

তোমাদের অনেকের মধ্যেই অতীব প্রশংসনীয় সদ্‌গুণ-সমূহ রহিয়াছে। আমার সহিত সাক্ষাৎকারের পর হইতে সেই সকল সদ্‌গুণের কতকগুলির প্রত্যক্ষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। আরও বহু সদ্‌গুণের তোমরা বাস্তব অধিকারী। কিন্তু নিরন্তর অনুশীলন ব্যতীত তাহাদের বিকাশ প্রত্যাশা করা যায় না তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণটীকে বিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

রাজগীর

২১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৭৯

(৮-১০-৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১০।৬।৭২ এর লেখাটুকু হইতে জানিলাম, তুমি নূতন এক বিমান-বন্দরে বদলী হইয়া আসিয়াছ। এখানেও চারিদিকে দুই চারিজন গুরুভ্রাতা-গুরুভগিনী ছড়াইয়া আছে, খোঁজ করিলেই দেখা-সাক্ষাৎ পাইবে। যাহাদের দেখিলে ঈশ্বরানুরাগ, সাধনানুকূল্য ও সদ্‌বিষয়ে রুচি বাড়ে, মাত্র তাহাদিগকে গুরুভ্রাতার সম্মান দেওয়া উচিত। রুক্ষ, রুষ্ট, দাম্ভিক, স্বার্থপর, কর্ত্তৃত্বাভিলাষী, ষড়যন্ত্রপরায়ণ, কুচক্রী ও মিথ্যাচারী ব্যক্তিরা একই দীক্ষা-শিবিরে প্রবেশ করিয়া একই সঙ্গে অন্যান্যদের সহিত দীক্ষা নিয়াছে বলিয়াই গুরুভাইএর বড় পীড়িটি পাইবে এবং কতক দিন পরে নিজেদের কুপ্রকৃতির তাড়নায় ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের প্রেমপূর্ণ জীবনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত কলুষ বিস্তার করিবে, ইহা কিন্তু গুরুভাইবোনদের সহিত পরিচয়ের সার্থকতা নহে। এই জন্যই তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে তোমার কোনও কার্যাস্থলেই গুরুভাইবোনদের সহিত পরিচয় স্থাপনের জন্য লিখি নাই। কিন্তু এমন স্থানে তুমি বর্ত্তমানে বদলী হইয়াছ, যেখানে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দুই চারিজন গুরুভাইবোনের সহিত পরিচয় হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য তোমাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছি যে,

(ক) গুরুভাই গুরুবোনদের সহিত দেখা হইলে অন্তরের শুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া নিবার ও বুঝিয়া নিবার চেষ্টা করিও যে, গুরুদেবের প্রদত্ত সুমহান্ আদর্শকে রূপবন্ত করিতে ব্যক্তিটীর আগ্রহ কিরূপ,

(খ) যাহাতে ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া তোমার এবং তোমার সম্পর্কে আসিয়া ইহাদের আভ্যন্তরীণ সত্তায় নবজাগরণ নব-উন্মেষণ নব-শিহরণ জাগিতে পারে, নিজের মনকে তদ্রূপ ভাবে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবে,

(গ) ইহাদের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনও সংশ্রব সৃষ্টি করিবে না এবং কি নৈতিক, কি আর্থিক কোনও দিক্ দিয়াই সত্যের ও সততার অপহ্নব ঘটিতে দিবে না।

এই ভাবে যদি সকলে সকল স্থানে তৈরী হইতে থাকে, তবে দলে দলে তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে জগতের কোনও অনিষ্টাশঙ্কা নাই বা সমাজের কোনও আতঙ্কের হেতু নাই।

সম্প্রতি দলে দলে দীক্ষা গ্রহণের যে প্রচণ্ড হিড়িকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহার কুফল যে কি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাকে বারংবার দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইতেছে। কিন্তু কয়েকটা অতীব সঙ্গত কারণে দীক্ষাদান বন্ধও করিতে পারিতেছি না। তন্মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান্ কারণ হইতেছে এই যে, মৎপ্রদত্ত দীক্ষা সাধক-মাত্রকেই জগৎকল্যাণের দিকে ধাবিত করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করে, যাহা অন্যান্য দীক্ষাবিধির মধ্যে নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দীক্ষার দৌলতে কত চোর সাধু হইল, কত লম্পট সংযমী হইল, কত দুর্নীতিপরায়ণ কুপথ পরিহার করিল, কত কত নিতান্ত স্বার্থপর মানুষ পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখিল। আর ভাললোকেরা আগের চেয়ে অনেক বেশী ভাল হইল। এমতাবস্থায় কিছু কিছু শঠ, প্রবঞ্চক, দুরাত্মার ভয়ে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া দীক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেই কি করিয়া? আমি ত কদাচ কাহাকেও জোর করিয়া দীক্ষা দেই না বা লোককে কৌশল করিয়া দীক্ষার ফাঁদে আটকাইবার জন্য দালালও নিযুক্ত করি না। অন্য কোনও মত বা পথকে নিন্দা করিয়া একটী বাক্যও উচ্চারণ করি না। এমনকি, আমার নিজের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতটী প্রচারের জন্য কোনও বক্তৃতামঞ্চকে ব্যবহারে আনি নাই। হাজার হাজার লোক কথা শুনিতে আসে, শুনাই ত কেবল

সর্ব্বজনের সুস্বীকৃত সুভাষিতাবলি,—আমার নিজের ধর্ম্মমতের কথা একমাত্র দীক্ষাগৃহের নিভৃত-নিকুনে ছাড়া প্রচারের কোনও অবকাশ নাই, রুচি নাই বা অভিপ্রায় নাই। তবু প্রাণভরা ব্যাকুলতা নিয়া বহু দীক্ষার্থী আসে। কত লোককে রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ফিরাইয়া দিব, বল! * * * * * *

দীক্ষা গ্রহণের পর শিষ্যমাত্রই অহঙ্কার, দম্ভ, কুটিলতা, কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার করিয়া সুবিনীত, সরল ও সেবাবুদ্ধিপরায়ণ মন নিয়া সাধন করিবে এবং একে অন্যকে সাধনে উৎসাহ দান করিবে, ইহা যতদিন শুধু কথার কথাই থাকিবে, ইহা যতদিন না কার্য্যে রূপ পাইবে, এইরূপ আচরণ যতদিন না সম্মানিত হইবে, এইরূপ সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণের জন্য যতদিন না কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, ততদিন শিষ্য-সংখ্যা-বর্দ্ধন সত্যিকারের লোকহিতকামী গুরুর নিকটে নিশ্চয়ই এক গুরুতর সমস্যা রহিয়া যাইবে। যুগের প্রয়োজনে তোমাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, যুগের প্রয়োজনেই তোমাদের শিষ্যত্ব প্রকৃত ও অবিকৃত হওয়া প্রয়োজন। এই শিষ্যত্বে যেন ভেজাল বা খাদ না মিশ্রিত থাকে।

তোমরা ত বাবা সাহিত্য-চর্চ্চা কর। এই বিষয়ে কি তোমরা তোমাদের লেখনী-পরিচালন করিতে পার না?

জীবনের কৃতিত্বের পসরা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া এক একটা মানুষ চলিয়া যান, লোকে হয়ত তাঁদের জন্য কাঁদে। কিন্তু তাঁহারা জগতের কাছে আর সমস্যা হইয়া থাকেন না। যাহা দিবার দিয়া, যাহা নিবার নিয়া, যাহা করিবার করিয়া তাঁহারা চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নূতন করিয়া যাহারা ধরার ধূলায় পদচিহ্ন ফেলিল, তাহারা কে কোন্ বাসনা, কোন কামনা, কোন্ অতৃপ্ত পিপাসা, কোন্ দুরপনেয় ক্ষুধা নিয়া

জামিয়াছে, তাহার খবর ত তুমি আমি বা অন্য কেহই জানে না। মুঠি মুঠি আটা-চাউল খাইয়া খাইয়া ইহারা বড় হইতে লাগিল, না ইহাদের সুগুপ্ত মনোভিলাষ ক্রমে ক্রমে নানা আকৃতি ও বিকৃতির মধ্য দিয়া বিকাশ পাইতে পাইতে আকাশ ছাইল, ভূতল গ্রাস করিল, পাতাল ভেদ করিয়া চলিল? কি করিবে ইহারা এই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ জগৎটাকে লইয়া? গিলিয়া খাইবে, না চূর্ণ করিবে? কি ইহাদের অভিলাষ, কেহ কি বলিতে পার? পার না বলিয়াই মানুষ অতীতকে নিয়া দুশ্চিন্তা করে না, যত দুশ্চিন্তা তার আগামীদের নিয়া। তুমি এক হিসাবে কবি। তুমি নিশ্চয়ই আমার মনের কথাটা বুঝিয়াছ। সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিও না কিন্তু খেয়াল রাখিও, তোমার সাহিত্য যেন তোমাকে বিশ্ববাসীর অন্তরের বেদনা বুঝিতে দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

রাজগীর

২১ আশ্বিন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—; প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম বিস্তারিত উত্তর দিবার অবসর নাই।

ঐক্যের যেমন মহত্ত্ব আছে, তেমন আনন্দও আছে। ঐক্যের যেমন গৌরব আছে, তেমন সার্থকতাও আছে। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হ

ঐক্যের একটী মূলসূত্র নিশ্চয়ই থাকিবে। কাহার অনুগত তোমরা প্রত্যেকে হইতে পারিলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির কখনও অভাব হইবে না, তাহাকে আগে চিনিয়া লও। ঐক্য ঐক্য জপিলেই ঐক্য হইবে না, সকলকে একজনের অনুগত আগে হইতে হইবে।

সংসারের সকল কর্ত্তব্যই ভগবানের সেবা জ্ঞানে সম্পাদন কর। সংসারও ভগবানের, সংসারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাও ভগবানের আর তুমি নিজেও ভগবানের। এই বোধটী কেবল নিজের ভিতর জাগাইলেই চলিবে না, সংসারের প্রতিটি প্রাণীর ভিতরে জাগাইতে হইবে। এই কাজটী প্রত্যেক সংসারীর অবশ্য-করণীয় বলিয়াই ত সংসারাশ্রমকে বড় কঠিন পরীক্ষার স্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর, ঠিক এই কারণেই সংসারাশ্রমকে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি ছাড়া সংসারের প্রাসাদ টিকে না, ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেই গরীব,—দিন আন, দিন খাও। কাহারও কাহারও দিন আনারও সুযোগ নাই। খাটিয়া খুটিয়া যে অন্ন অর্জ্জন করিবে, তাহার জন্যও ত সুযোগের প্রয়োজন। তোমাদের দুঃখ ও কষ্টের কথা ভাবিয়া আমিও নিয়ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও জানি যে, আমার অশ্রু আমার মলিন নেত্রপুটকেই নির্ম্মল করিতে পারে, তোমাদের দারিদ্র্য দূর করিতে পারে না। তোমাদের নিজ নিজ দারিদ্র্য নিজ ভুজবলেই দূর করিতে হইবে।

তোমরা চির-দারিদ্র্যের ভিতরে থাকিয়াও ভগবানের নাম কখনও ভুলিয়া যাইও না। একদিকে দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য তুমুল সংগ্রামে রত থাক, অন্য দিকে পরমমঙ্গলময় ভগবানের পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া দেহে মনে প্রাণে বল, উৎসাহ ও নবসঞ্জীবনা সঞ্চয় কর।

কেহ সমবেত উপাসনায় যোগদান করে নাই বা করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, ইহা অদ্ভুত প্রস্তাব। সকলকে বিনীত ভাবে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিবে। যে আসিল, তাহাকে সমাদর করিবে, সম্মান করিবে, অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়া অভিনন্দন করিবে। যে আসিল না, তাহাকে নিয়া চর্চা করিবার প্রয়োজন কি? বারংবার ডাকিলেও না আসিলে বিরক্ত হইও না। এজন্য কাহাকেও রুষ্ট কথাও বলিও না। উপাসনা এমনই জিনিষ যে, অপরকে নিন্দা, উপহাস, বিদ্রূপ বা শাসন করিবার বুদ্ধি মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হয়।

মণ্ডলীর উপরে কদাচ কলহের কালোছায়া পড়িতে দিও না। মণ্ডলীর প্রতিটি কর্ম্মক্ষেত্রে যেন আনন্দোচ্ছল সরল হাসির ঔজ্জ্বল্য নিয়ত খেলা করে। কাহারও কুবুদ্ধিতে পড়িয়াই কলহের রাস্তা বাছিয়া নিও না। মণ্ডলীর ক্ষতিকর কাজ কেহ করিলে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণীয় কিন্তু যাহার মীমাংসা মুখামুখি আলোচনায় হইতে পারে, তাহা নিয়া বিবাদের হট্টগোল কেন সৃষ্টি করিবে? মণ্ডলীর ব্যাপারে কেহ নিজের স্বার্থকে বড় করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়েও মণ্ডলীর স্বার্থ অনেক বড়, কারণ অখণ্ডমণ্ডলী তোমার গুরুদেবের সঙ্ঘময়ী মূর্ত্তি, মণ্ডলী তোমার গুরু-বিগ্রহ।

নিরন্তর ভগবানের মঙ্গলময় নামে মন লাগাইয়া রাখিয়া জীবনের পথ নির্ভয়ে চলিবে। রিপুর তাড়না, কামের ছলনা, আশার বঞ্চনা ও মোহের প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া চলিবার ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ আর কিছু নাই। যাহারা নামে অবিশ্বাসী, তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকা ভাল। তবে তাহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া তাহাদের উপরে রুষ্ট হইও না।

আজ যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, নামের শক্তিতে সন্দিগ্ধ, কাল তাহারা তাহা নাও থাকিতে পারে। কেহ নাস্তিক হইলেই বা ম্লেচ্ছ হইলেই আমাদের শত্রু হইয়া গেল, এই-জাতীয় সঙ্কীর্ণ মনোভাব আমাদের পক্ষে একান্তই গর্হিত। তবে, যাহারা ঈশ্বরের নাম করিয়া বিদ্রূপ করে, ভগবদ্বিশ্বাসীদিগকে নিজ নিজ স্বাধীন রুচি অনুযায়ী সাধন-ভজনের পথে চলিতে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া নিজের কাজ নিজে করিয়া যাওয়াই সুবুদ্ধিসঙ্গত। ক্ষেত্র বুঝিয়া কাজ করিও। এই বিষয়ে ধরাবান্ধা কোনও নিয়ম লিখিতে পারিতেছি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

রাজগীর
২১ আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীর কাজ সুচারু রূপে চালাইবার জন্য তোমরা যাহা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহার আমি অনুমোদন করিতেছি। অথগুমণ্ডলীর কতিপয় প্রধান কাজের মধ্যে সকলকে লইয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় বসা এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে এই কর্ত্তব্যটুকু সমাপন করা সব-চেয়ে বড় কথা। উপাসনা এমন ভাবে এমন স্থানে করা প্রয়োজন যেন অধিক-

সংখ্যক আগ্রহী নরনারীরা ইহাতে যোগদান করিতে পারে। বাস্। এই কাজটাই যদি তোমরা নিষ্ঠার সহিত কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে করিয়া যাইতে পার, দেখিও, তোমাদের মণ্ডলী আপনা আপনি কত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। শক্তি আসে নিষ্ঠা হইতে, আস্ফালন হইতে নহে।

মানুষের ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার বা বুদ্ধিমত্তার অভিমান অনেক সময়ে মণ্ডলীর শান্ত স্বচ্ছ পরিবেশকে দুর্গন্ধময় ও ক্লেদাক্ত করে। ইহাতে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, মণ্ডলীর অপর সকল কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া হইলেও সকলের সম্মিলিত সমবেত উপাসনাটিকে অবলম্বন করিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া। খুব তাড়াহুড়া করিয়া মণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক সময়ে অকারণ কর্ম্ম জুটাইয়া অনাবশ্যক গলদ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। এই গলদগুলি গলগ্রহ হইয়া কর্ম্মীদের সর্ব্বশক্তিকে ভারাক্রান্ত করে। ব্যক্তিগত মহত্ত্ব-সম্পর্কিত অহমিকা মানুষের এমনই দুর্ব্বার যে, অনেক সময়ে তাহা প্রচার, সংগঠন, অর্থ-সংগ্রহাদি অভিযানের রূপ ধরিয়া ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মীদের মধ্যেও নূতন নূতন বিভেদ সৃষ্টি করে। কেবল কি তাই? আমি উপাসনার শুদ্ধ সুর জানি, তুমি জান না, আমিই উপাসনা পরিচালন করিব, তোমাকে করিতে দিব না, আমি শেষে আসিয়াও আগে বসিব, তুমি আগে আসিলেও আমার পিছনেই বসিবে,—এই সকল আবদারও তাদের যোগ্য অপকাজটুকু করিয়া যায়। এই সব স্থলে শক্ত হইতে হয়। যে যাহা করিবার করুক, যে যাহা বলিবার বলুক, আমার কাজ উপাসনাটুকু সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া করিয়া যাওয়া। এইরূপ জিদ নিয়া তোমরা সাপ্তাহিক উপাসনাটিকে নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া যাও। তোমাদের মণ্ডলীর আত্মরক্ষা এবং পরিপুষ্টি ঠিক এই উপায়েই হ'বে।

যে জাতির কলহের স্বভাব মজ্জাগত, তাহারা ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াও কলহ বাঁধাইবার ছলছুতা খুঁজিয়া বাহির করিবে। এই এক দোষের জন্য জগতের কত স্থানে যে তাহাদের কত লাঞ্ছনা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে নানা স্থানে হইবে, এই বিষয়টা নিয়া তাহারা একটু চিন্তা করিবারও অবকাশ পায় না। তোমাদের অখণ্ডমণ্ডলীগুলির মধ্যেও কোথাও কোথাও জাতিগত এই মজ্জাগত দোষটা আশ্রয় পাইয়াছে। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিটি ব্যক্তির যদি না থাকে আনুগত্য, তাহা হইলে, তাহারা একত্র মিলিয়া জটলা করিতেছে বলিয়াই ত আর সংঘপত্তন হইয়া গেল না। বুদ্ধকে যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মানিত না, সে কি বুদ্ধের সংঘে স্থান পাইত? তাহাকে কি সকলের সহিত মিলিয়া ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি বলিতে অধিকার দেওয়া হইত? মণ্ডলীতে তোমাদের মিলিত হইবার ব্যাপারে এই দৃষ্টান্তটী নিশ্চিতই সকলের স্মরণ-পথে নিত্য-জাগরূক থাকা প্রয়োজন।

গত বৎসর আমি মণ্ডলীর সভাপতি বা সম্পাদক ছিলাম, কিম্বা আমিই ত গরজ করিয়া এখানে প্রথমে মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলাম, তবে এবারও আমিই কেন সভাপতি বা সম্পাদক থাকিব না, এই যুক্তিতেও কোথাও কোথাও কোন্দল হইতে দেখিতেছি। মণ্ডলীর কার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য বছরে বছরে বা কয়েক বৎসর পরে নূতন কর্ম্মিদলকে কাজের ভার দেওয়া নানা কারণেই সঙ্গত হয়। যদি এই সঙ্গত ব্যবস্থাই অধিকাংশ সদস্য নিতে ইচ্ছুক হন, তবে, এবার যিনি নির্দ্দিষ্ট একটী অভীপ্সিত পদ পাইলেন না, তাঁহার আফশোষ করিবার হেতুটা একমাত্র আত্মাভিমান ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মণ্ডলীর সেবা সকলে সেবকের বুদ্ধি নিয়াই করিও কর্ত্তৃত্বের বুদ্ধি নিয়া

নহে। তাহা হইলেই দেখিবে, মণ্ডলী একটী বিরাট প্রেম-প্রস্রবিণী, যাহার ধারা হইতে প্রতিজনে বিপুল পরিমাণ প্রেমপ্রীতি আহরণ করিয়াও ইহাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছ না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

রাজগীর

৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৭৯

(২৪ নবেম্বর, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিও। তোমাদের পিতৃদেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন জানিয়া ব্যথিত হইলাম। তাঁহার আত্মার নিত্যশান্তি কামনা করি।

যদিও অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ আমি কাহারও পক্ষে বাধ্যকর করি নাই, তথাপি তোমরা কেহ কেহ স্বেচ্ছায় এবং নিজ নিজ অন্তরের শ্রদ্ধাবশতঃ অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনা দ্বারা এই সকল পুণ্যজনক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাও দেখিয়া আমি খুবই সুখানুভব করি, একথা স্বীকার করিতে আমার কুণ্ঠার কারণ নাই। প্রচলিত মতে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠানকে আমি স্বতঃ বা পরতঃ, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কখনো গর্হণ করি নাই কিন্তু তথাপি যুগপ্রয়োজনে মানুষের মন যদি নূতন প্রথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং সেই প্রথাটী অখণ্ড-মতানুসারী হয়, তবে তাহাতে আমার অখুশী

হইবার কোনও কারণ দেখি না। তথাপি আমি এই সকল কার্য্যে ঘনিষ্ঠ গুরুজন এবং নিকট আত্মীয়-বর্গের অনুমোদন ও সহযোগিতার অপেক্ষা রাখিতে সকলকেই নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়া থাকি। কারণ, পারিবারিক কোনও বিষাদমূলক বা আনন্দজনক উৎসবেই ইঁহাদের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার চেষ্টা সামাজিক শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে পারে।

তোমরা পিতৃশ্রাদ্ধ অখণ্ডমতেই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ এবং পাঁচটী সহোদর ভাই সমান আগ্রহ নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ। তোমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমি বিগত দুই মাস কাল এক অবর্ণনীয় ছুটাছুটির মধ্যে রহিয়াছি বলিয়া ইহার পূর্ব্বে তোমাদের পত্র পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই।

তোমরা পাঁচ ভাই পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্প্রীতি-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া পিতৃ-চরিত্রের মহনীয় গুণাবলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হও। পুত্রগণের পক্ষে ইহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধকার্য্য জানিবে। পিতার দেহত্যাগ পুত্রদের দেহের ও মনের পূর্ণতর বিকাশের একটী চূড়ান্ত দাবী মাত্র। তাঁহার মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতে দেখিও। সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া তোমরা পিতৃপদাঙ্কের অনুসরণ-ক্রমে জগতে দিব্য প্রেম এবং নিষ্কাম সেবার আদর্শ-প্রচার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

রাজগীর
১০ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৭৯
(২৬ নবেম্বর, ১৯৭২)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। দুপুরে খাইতে বসিয়া ভাতের গ্রাস হাতে নিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাও যে, বিকালে কি খাইবে, পুত্রকন্যাদের কি খাওয়াইবে। ইহা অপেক্ষা করুণ কাহিনী আমাকে আর কি শুনাইতে পারিতে মা? দিনের পর দিন শরীরকে কদন্নে আর অর্দ্ধাশনে শীর্ণ করিতেছ, তবু বাঁচিয়া আছ এবং বাঁচিয়া আছ শুধু ক্লেশই পাইবার জন্য। ঘরে ঘরে তোমাদের এই যে নিদারুণ অন্নাভাব, তাহা যতদিন দূর না হইবে, ততদিন আমার প্রাণে শান্তি নাই।

কিন্তু দারিদ্র্যই তোমার একমাত্র দুঃখ নয়। কুসংস্কারের দাসত্বও কম দুঃখ নহে। মাথার চুলগুলিতে অযত্নে জটা বাঁধিয়াছে। তোমাকে কি একথাই ভাবিতে হইবে যে সাক্ষাৎ মহাদেব আসিয়া তোমার মাথায় ভর করিয়াছেন, জটা আর কাটিবার উপায় নাই? মাথার জটাগুলি সব একটী একটী করিয়া কাটিয়া মস্তকটাকে পরিচ্ছন্ন কর এবং তোমার মাথায় আর নূতন চুল গজাউক বা না গজাউক, প্রত্যহ দুই বেলা নিয়মিত ভাবে মাথায় চিরুণী চালাইয়া যাও। মহাদেব বলিয়া যদি কেহ থাকিয়া থাকেন, তবে তিনি ইহাতেই বেশী সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার ভয় পাইবার কোনও কিছুর কারণ নাই। মাথায় জটা গজাইলেই মহাদেবের কৃপা হয় আর সেই জটা কাটিয়া ফেলিলেই মহাদেব ত্রিশূল নিয়া তোমাকে

বধ করিতে ছুটিয়া আসিবেন, এই সকল গ্রাম্য কুসংস্কার পরিহার কর। মহাদেব অত ঠুনকো দেবতা নহেন যে, কথায় কথায় রাগ করিবেন আর ত্রিশূল ছুঁড়িবেন। আদিম কালের মানুষদের প্রায় প্রত্যেকেরই মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল ছিল এবং জটাও হইত। চিরুণীর ও কাঁচির আবিষ্কারের পরে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আবার কাঁচি ও চিরুণী বর্জ্জন করিয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার মত কোনও সঙ্গত কারণ ঘটে নাই মা। জটা কাটিয়া ফেল, মাথা পরিষ্কার কর, উকুন এবং বোঝার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ কর। এক এক পাক জটার ভিতরে দুনিয়ার কত দেশের কত ধূলা-বালি ও রোগ-বীজাণু জমিয়া থাকে, তাহা যে-কোনও রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিবার চেষ্টা করিলে আতঙ্কিত হইবে। তোমার মাথাটি পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিলে মহাদেব মোটেই রাগ করিবেন না, বরং খুশী হইবেন। মহাদেব বড় ঠাণ্ডা দেবতা, তাঁর কাম-ক্রোধ বড় কম, নামে রুদ্র হইলেও তিনি কদাচ অনাচারী দেবতা ছাড়া অন্য কারো উপরে চটেন না। ত্রিশূল তাঁর হাতের শোভা মাত্র। বরং তাঁহার ষাঁড় দুটাকে ভয় পাইও, মহাদেবকে ভয় করিবার কিছু নাই। তিনি সবই ভুলিয়া যান, কারো দোষ মনে রাখেন না, তাই তার নাম ভোলানাথ।

আর একটী কথা। এত বড় জটার বোঝা মাথায় নিয়া ত মহাদেবের খুব পূজা করিয়াছ। এখন একবার গুরুদত্ত নামের পূজায় লাগিয়া দেখ ত! যে নামে জীবনের সকল ধাঁধা ঘুচিয়া যাইবে, যে নামে অন্তরের সকল দ্বন্দ্ব মুছিয়া যাইবে, যে নামে সকল ভীতি, সকল আতঙ্ক, সকল সংশয়, সকল সন্দেহ দূর হইবে, একবার সকল পূর্ব্বসংস্কার পরিহার করিয়া সেই নামে মনপ্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিয়া দেখ না মা।

সমস্ত জীবনটাই ত কেবল চাখিয়া চাখিয়া বেড়াইলে। কোনো কিছুতে ত আর ডুবিলে না, মজিলে না, আত্মহারা হইলে না। এ-ঘাটের এক ছিটা জল, ও-ঘাটের এক ফোঁটা জল, এই ত কেবল পান করিলে। সকল পিপাসা মিটাইয়া দিয়া কোথাও ত অঞ্জলি ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিলে না। ডুবিলে না, মজিলে না। সুতরাং আর পাইলেও না। সত্যিকারের পাওয়া পাইবার জন্য জিদ করিয়া একবার গুরুদত্ত নামের নেশা জমাও। দশ দিকে মন দিলে নেশা আসে না, ধ্যান জমে না।

পূর্ব্ব সংস্কার যে সবলে ছিন্ন করিতে পারিবে না বা ছিন্ন করিতে চাহিবে না, তাহার পক্ষে মহতের কাছে দীক্ষা নিবার চেষ্টা করা সকল সময়ে সমীচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমি শিষ্যমাত্রকেই সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া যাইতেছি বলিয়া একথা সত্য হইতে পারে না যে, দীক্ষা নিবার পরে গুরুর প্রদর্শিত পথ হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া নিজ নিজ রুচিমতন সাধন করিয়া যাওয়া বাস্তবিকই লাভজনক। গুরু তোমার কাছ হইতে কোনও স্বার্থের দাবী রাখেন না বলিয়াই তুমি সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত পথ হইতে বিচ্যুত থাকিবার অধিকার পাও নাই। গুরুদত্ত নামে মন দিলে তবে এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। আজ তিন বৎসর হয় দীক্ষা নিয়াছ। নিয়মিত আত্মিক কর্ত্তব্যগুলি করিয়া গেলে এই তিন বৎসরে তুমি কত অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিতে, ভাবিয়া দেখ। তবে, আফশোষ করিয়া সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। এতকাল যাহা করিতে ভুলিয়া গিয়াছ, এখন হইতে তাহা করিতে সুরু কর।

সাতটী ছেলে ও মেয়ের মা হইয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ছেলেমেয়েরা সবল স্বাস্থ্য নিয়া সুখে দীর্ঘ-জীবন যাপন করুক। আর

সন্তান দিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে ? স্বামীর সহিত শারীরিক সম্পর্ক যদি ছাড়িয়া দিয়া থাক, তবে খুব ভাল কাজ করিয়াছ। তবে এই বিষয়ে তাঁহার যেমন সম্মতি থাকা দরকার, আগ্রহও থাকা দরকার। এজন্য চাই দুই জনের আদর্শবাদের সাদৃশ্য ও চিন্তাধারার সমতা। তাহা হইলে সংযম-পালনে তুমি সহজে সমর্থ হইবে। যে দম্পতী সংসারী-জীবনে সংযম পালন করিতে পারে, তাহাদিগকে আমি দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি এবং মনে মনে পূজা করি। অতীত ভারতে শিব-পার্ব্বতীর জীবনকে এই আদর্শ হইতেই দেখা হইত।

দরিদ্রতা তোমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। বহু সন্তান জন্মিলে দরিদ্রতা কখনই দূর হইতে পারে না। সুতরাং সংযমের পথই প্রকৃত মঙ্গলের পথ। সন্তান-সংখ্যা কমাইবার জন্য হাজার রকমের পথ যদি আবিষ্কৃত হইয়াও থাকে, তথাপি সংযমের পথই শ্রেষ্ঠ পথ, সংযমের পথই মঙ্গলজনক পথ।

বিবাহের উদ্দেশ্য বহুবিধ হইতে পারে। কেহ কেহ কেবল সন্তানোৎপাদনের জন্যই বিবাহ করে এবং সন্তান হইয়া যাইবার পরে দৈহিক সম্পর্ক অনাবশ্যক জ্ঞান করে। কেহ কেহ নিরঙ্কুশ ভাবে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ করিবার সুযোগ পাইবার জন্যই বিবাহ করে এবং যতকাল ইন্দ্রিয়-সমূহের ভোগসামর্থ্য থাকে, ততকাল বিবাহিত জীবনকে পরম সুখকর বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু একটী মানবশরীরের সহিত একটী মানবী-তনুর মিলনের ফলে যে এক অশরীরী সম্প্রীতির উদয় হয়, তাহার ভিতর দিয়া একটী আত্মার সহিত আর একটী আত্মার প্রকৃত আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধটুকু আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বলালসার, সর্ব্ব পিপাসার ঊর্দ্ধদেশে গমনের পক্ষে বিবাহ যে একটী উপায়, একথা গৃহস্থাশ্রমী যোগী পুরুষ বা

মহিলাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। শরীরকে অতিক্রম করিয়া যে আত্মা, তাহাকে চিনিতে পারার নামই প্রেম। এই প্রেমের সাধনাই বিবাহের বিশ্বমঙ্গল উদ্দেশ্য।

এভাবে যাহারা বিবাহকে দেখে, তাহাদের কাম আপনি কমিয়া যায়। তোমরা দুজনে বিবাহকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি ওঁ

বারাণসী

১৪ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৭৯

(৩০ নবেম্বর ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

খবরের কাগজে বোধহয় দেখিয়াছ, সারনাথে দুই হাজার হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পত্রিকায় যে ফটো দেখিলাম, তাহাতে অনেক গান্ধীটুপী চখে পড়িল। অর্থাৎ যথেষ্ট-সংখ্যক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার অধিকারী-দলের হয় সদস্য, নয় অনুরাগী, নয় পৃষ্ঠপোষক নতুবা ভাণধারী ছদ্মবেশী কিছু পাণ্ডা ইহাতে আছেন। এমন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক গান্ধীটুপিটা ব্যবহার না করিলে যে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার আজান-প্রদানকারীদের কোন ক্ষতি হইত না, সম্ভবত তাহা বুঝিয়াছ। কিন্তু এতগুলি হিন্দু যে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়িয়া বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিল,

ইহা কিসের ফল? এই লোকগুলিকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবদানে এবং হিন্দুসমাজের সদ্ব্যবহারে অধিকার দেওয়া হয় নাই। ফলে ইহাদের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার সম্ভব করিবার জন্য পরোক্ষে, রাজনৈতিক নেতারা এবং ক্ষমতার অধিকারীরা, নানা কাজ বিগত সিকি শতাব্দী ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক শ্রমণদিগকেই কেবল প্রশংসা করিতে হয় না, প্রশংসা এই সকল রাজনৈতিক ভদ্রলোকদেরও প্রাপ্য। এই জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান ভারতে কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্বে কয়েকবারই হইয়া গিয়াছে। তবে সে সকল অনুষ্ঠানের ছবি খবরের কাগজে দেখি নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া লাগিয়া থাকিলে এইরূপ ব্যাপক সফলতা সকলের পক্ষেই সম্ভব এবং সর্ব্বত্রই সম্ভব। প্রেম-সহকারে প্রচার-কার্য্য করিলে জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।

খবরের কাগজে বোধহয় আরও দেখিয়াছ যে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক বিলিগ্রাহাম ডিমাপুরে আসিয়াছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন আরও দ্বিশতাধিক যাজক। ইঁহারা সাত দিন ডিমাপুরে থাকিবেন এবং এক লক্ষ নাগাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। ইনি যে বক্তৃতা করিবেন, তাহার চৌদ্দটী ভাষার অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হইবে। এই বিরাট সমারোহ-পূর্ণ দীক্ষাকাণ্ডের বর্ণনা শুনিতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগিতেছে। এতবড় বিরাট ব্যাপারটা সম্ভব করিতে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের একশত বৎসর লাগিয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যারম্ভের এইটাই শতবর্ষ-পূর্ত্তি।

এই সকল হইতে বুঝিয়া দেখ এবং শিক্ষা কর যে, প্রচার-কর্ম্ম কি রকমের কাজ। ভারতে প্রথম যখন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন পাঁচ,

দশ বা বিশ বছরের চেষ্টায় তাঁহারা সর্ব্বসাকুল্যে সম্ভবতঃ বছরে একশত দুইশত বা পাঁচশত লোককে দীক্ষিত করিতেছিলেন, এখন খৃষ্টান যাজকেরা বৎসরে গড়ে পাঁচ হইতে দশ হাজার লোককে নিজধর্ম্মে দীক্ষা দেন। ডিমাপুরে সংখ্যাটা এক সপ্তাহে এক লক্ষ হইবে। এত বড় সংখ্যায় এক সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাদান বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। এত বড় সাফল্যের মূলে প্রচুর প্রলোভন, প্রচুর অর্থব্যয়, প্রচুর উৎকোচ, প্রচুর রাজনৈতিক কূট বুদ্ধি থাকিলে থাকিতে পারে কিন্তু বহুসংখ্যক অকপট খৃষ্টভক্তের যুগ-যুগ-ব্যাপী অথবা শতাব্দী-ব্যাপী কুণ্ঠাহীন সেবা এবং অপরিসীম ত্যাগ যে রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

সেই ত্যাগ, সেই নিষ্ঠা, সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা তোমাদের ভিতরে আসা যে প্রয়োজন,—এই কথাটা পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অখণ্ডগণ যত অধিক পরিমাণে বুঝিবে, ততই তোমাদের কুশল, ইহা জানিও। আমার পত্রখানা পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই যে তুমি দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীমান্ নাম্‌তিং নাগার বাড়ীতে প্রচুর ঔষধপত্র লইয়া গিয়াছিলে এবং তাহার স্বাস্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে উপযুক্ত ঔষধ দিয়া আসিয়াছ, এই সংবাদে বড়ই খুশী হইয়াছি। তোমার পত্র হইতেই বুঝিতেছি যে, এই সকল নাগারা আমার নিকট হইতে হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা গ্রহণ করে নাই এবং ইহারা সত্য সত্যই দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমন মানুষগুলির ভিতরে আমাদের কত যে কাজ করিবার আছে, বলিবার নহে। সমগ্র পাহাড়-অঞ্চলে যত জায়গায় আমার যত জন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বঙ্গভাষাভাষী শিষ্য আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমার রচিত গ্রন্থাবলী বার'বার পাঠ করিয়া করিয়া, আমার

রচিত গানগুলি গাহিয়া গাহিয়া, আমার উপদেশ-বাণীগুলি অখণ্ড-সংহিতা হইতে শ্রবণ করিয়া করিয়া আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত সুপরিচিত হইতে অনুরোধ কর এবং পাহাড়ী ভাষাগুলিতে যার যতটুকু দখল আছে, তাহা প্রয়োগ করিয়া বন-পাহাড়ের অনাদৃত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সেই চিন্তা ও সেই আদর্শকে প্রচার করিতে প্রেরণা দাও। তোমরা যদি সদ্‌বুদ্ধি লইয়া যাও, তোমরা যদি সততা সহকারে কাজ কর, তোমরা যদি বাগে পাইয়া কোনও সরল-চিত্ত পাহাড়ী পুরুষ বা নারীকে কদাচ প্রবঞ্চনা না কর, তাহা হইলে ইহারা তোমাদের প্রতিজনের প্রতিটি বাক্যকে বেদবাক্যের অধিক সম্মান দান করিবে। তখন তোমাদের মুখের কথায়ই অসাধ্য সাধিত হইবে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া যাঁহারা এক লক্ষ নাগাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের কোলে তুলিয়া নিতে পারিয়াছেন, এই দেশের অধিবাসী হইয়া তোমরা তাঁহাদের চেয়ে শতগুণ শক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে পারিবে। আচরণের সততা ও অন্তরের উদার প্রেম তোমাদের মত সাধারণ কর্ম্মীদের দ্বারাই অসাধারণ কাজ করাইয়া নিবে। মানুষ উদরান্নের প্রয়োজনেই চাকুরী করে, ব্যবসায় করে কিন্তু ইহাদিগকে না ঠকাইয়াও চাকুরী করা যায়, ব্যবসায় করা যায়।

ভাষা-দাঙ্গার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আসামে আসা বেশ কতক মাসের জন্য স্থগিত হইয়া গেল, নতুবা দুইটী উল্লেখযোগ্য পার্ব্বত্য জাতির ভিতরে বিশেষ ভাবে কাজ করিবার এবার আমার ইচ্ছা ছিল। সমগ্র পার্ব্বত্য অঞ্চলের বঙ্গভাষী অখণ্ডদের জানাইয়া দাও যে, বন-পর্ব্বত-বাসী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করিতে এখন হইতেই তোমাদের প্রতি জনকে নামিয়া যাইতে হইবে। হাজার কাজের মাঝেও প্রত্যেককে এ কাজের জন্য ফাঁক করিয়া নিতে হইবে। সপ্তাহে একটী দিনই ত' কাজ

করিতে হইবে। বাকী ছয় দিন তোমরা চুরাইয়া সংসারের কর্ত্তব্যপালন কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

বারাণসী

৩রা মাঘ, বুধবার, ১৩৭৯

(১৭-১-৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা তোমাদের দাম্পত্য সংযম-পালনের বোধ হয় বারো কি তেরো বৎসর নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করিলে। আমার মনে হইতেছে, আমার সন্তানদের এই সংযমের সুফলে, আমারই যেন বারো তেরো বৎসরের পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া গেল। তোমরা যাহা করিলে, তাহা শতকণ্ঠে প্রশংসনীয়। আমার অজস্র ধারায় আশীর্ব্বাদ লাভের তোমরা যোগ্য হইয়াছ। অন্য কেহ হইলে তোমাদের এই অসাধারণ সাফল্যে কত উদ্বেলিত হইয়া বহ্বাস্ফালন করিতেন। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, আমার সন্তানদের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সংযম-পালনের এই ব্যাপারে নিজ নিজ দাম্পত্য জীবনে অতি সহজেই সাফল্য অর্জ্জন করিয়া এক একটা দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে। এই জন্যই আমি অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। বরং তোমাদের উপরে পরমেশ্বরের করুণার কথা ভাবিয়া, আমার উপরে পরমেশ্বরের অপার অনুগ্রহের

কথা ভাবিয়া, আমার দেশবাসীর প্রতি এবং সমসাময়িক মানব-সমাজের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষের কথা ভাবিয়া ভক্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ ভাব অনুভব করিতেছি। অধিক সন্তানের প্রয়োজন যখন তোমাদের নাই, তখন পরবর্ত্তী আরও একটা দুইটা বৎসর বা তৎ-পরবর্ত্তীও দুই চারিটি বৎসর তোমরা সংযম-পালনে রুচি ও আগ্রহ অনুভব করিলে যেন ব্রতে স্থির থাকিতে পার এবং লক্ষ্য-লাভে কৃতকার্য্য হও, আমি বিভুপদে গভীর আকুলতার সহিত এই প্রার্থনা করি। পুত্র বা শিষ্য যদি সংযমী, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, পরহিতব্রত ও মানবমাত্রের প্রতি প্রেমিক হয়, তবে পিতা বা গুরুর যে কি আনন্দ, তাহা কি বলিব ?

জগতের নানাবিধ হিতকর্ম্ম অর্থ দ্বারা করিতে অনেকেই সমর্থ নহে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, এক টুকরা রুটি লইয়া তত অধিক কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার ফলে পরের জন্য দানের রুচিও কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহারা সংযম-পালন করিয়া পৃথিবীর জনসংখ্যাকে একটা সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, গৌণতঃ তাহারা জনহিতব্রতী ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু অবারিত কামসম্ভোগের তাড়নাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমাদের নিজেদের ভিতরে মালিন্যহীন যে এক পবিত্রতার উদ্ভব হইতেছে, রতিক্রিয়া হইতে দেহকে ও রতিচিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আনিবার চেষ্টার মধ্যে যে অন্তরের এক দিব্যীকরণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমশঃ ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাদের সমাজ ও জাতির ভিতরে সকলের অজ্ঞাতসারে এক স্থায়ী শৌর্য্যের আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর করিতেছে। ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের প্রতি শাসন-দণ্ড পরিচালনের

যোগ্যতা-সম্পন্ন জাতি যদি নিজেদের মধ্যে অযথা অনৈক্যের চর্চ্চা না করে, তাহা হইলে তাহারা কটাক্ষে বিশ্ববিজয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। কামুকেরা, লম্পটেরা, দুশ্চরিত্রেরা, রতিবাসনার ক্রীতদাসেরা, কামসম্ভোগ-রূপ নরকের কীটেরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া গ্রাম-নগর-জনপদ অধিকার ও ধ্বংস করিয়া যাহার মহিমা গাহিয়াছে, তাহা ঐক্যের, সুশৃঙ্খলতার, কর্ম্মপটুত্বের। কিন্তু সংযমের পৃথক্ এক শক্তি আছে। ঐক্য, শৃঙ্খলা আর পটুত্ব যেদিন সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন জগৎ হইতে দানব-কুলের অট্টহাসি আর তাণ্ডব-নৃত্য উভয়ই নির্ব্বাসিত হইবে। এই জন্যই ব্যাপক ভাবে ঘরে ঘরে সংযম-ব্রত পালনের নিষ্ঠাবুদ্ধি এক নিদারুণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই যে সেদিন ভারতীয় জওয়ানেরা পূর্ব্ববঙ্গকে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দানের জন্য রক্তাহুতি দিয়া আসিল, তাহাদের একজনও যে একটী রমণীর গায়ে হাত ছোঁয়াইল না, এই যে অভাবনীয় সংযম পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র তাহারাই প্রথম দেখাইল, ইহার দ্বারা কি তাহারা নিজেরা অধিকতর শক্তিমান্ হয় নাই? আর, ইহারই ফলে কি সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে একটী নূতন শক্তির সঞ্চারণা হইল না? আর, তিন মাস সমানে যুদ্ধ-পরিচালনার উপযুক্ত সমর-সম্ভার হাতের মুঠার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও যে পাকিস্থানী সেনাপতি প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সহ ভারত ও বাংলাদেশের যুদ্ধ-কম্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ কি তাহাদের দ্বারা প্রায় পনের লক্ষ বাঙ্গালী নারীর সতীত্বনাশের ফলস্বরূপে দেহে, মনে, আদর্শবাদে, সৎসাহসে ও বিশ্বাসে দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া নহে? অসংযম কাহাকেও সবল করে না,—তাহা বৈধ সম্ভোগই হউক, বা অবৈধই হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

বারাণসী
৪ঠা মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৭১
(১৮-১-৭০)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * *

কতকগুলি স্থান আছে, যেখানে আমার ছেলেমেয়েদের কাছে কাজ করিবার নির্দ্দেশ গেলে তাহারা সর্ব্বপ্রকার যুক্তিতর্ক ও আলোচনা-প্রত্যালোচনা ছাড়িয়া দিয়া অতন্দ্র আগ্রহে কাজে লাগিয়া যায়। কে বিরুদ্ধ মত প্রচার করিল, তাহাকে খুঁজিয়া নিয়া তর্ক করিয়া পরাস্ত করিতে হইবে বা অবস্থা-বিশেষে তাহাকে দুই একটী বেদনাদায়ক উক্তি করিয়া আঘাত করিতে হইবে, এইরূপ কাজে নহে, কে কোথায় আছে যে আমাদের মতাদর্শ সম্পর্কে কিছু জানে না বলিয়া উদাসীন, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার কাণের কাছে অমৃতবাণীর বীণা-ঝঙ্কার তুলিতে থাকার কাজে। পৃথিবীর সব লোক আমাদের মতেই চলিবে, এ আশা দুরাশা কিন্তু পৃথিবীর সব লোক আমাদের বিরুদ্ধতাই করিবে, এ আশঙ্কাও অমূলক। যেখানে যাহারা বিরোধ করিতেছে, তাহারা প্রকারান্তরে যে আমাদের সহায়তাই করিতেছে, এই বিশ্বাসটী আমাদের অটুট থাকা প্রয়োজন। যেখানে যে-কেহ কোনও কিছু বিরুদ্ধ উক্তি করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া আসিতে হইবে, আমাদের এমন কোনও গরজ থাকা উচিত নহে। কেহই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে অধিকারী নহেন, এমন ধারণা করিতে যাওয়া এক প্রকারের কুসংস্কার বা গোঁড়ামি। কেহ কিছু আমাদের বিরুদ্ধে বলিলেই

মুখের ভাষা দিয়াই মুখের ভাষার প্রত্যুত্তর জোগাইতে হইবে, ইহা দুর্ব্বলের কাজ। সবলেরা অন্য ভাবে কাজ করেন। সবলেরা একজনের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাবের আভাস দেখিলে সহস্র জন উদাসীন ও নির্লিপ্ত ব্যক্তিকে নিজেদের মতাদর্শের আকর্ষণে কাছে টানিয়া আনিয়া নিজেদের বল বাড়াইয়া লন। ইহারই নাম সংগঠন। সংগঠন এক মহাবল। মহাবলী স্বভাবই নম্রস্বভাব ও অমানীতে মানদ হইয়া থাকে। এই কথাগুলি যুবক ও কিশোর কর্ম্মীদিগকে বুঝিতে দাও। সাহস-সাধ্য, শ্রমাপেক্ষ, আত্মভোলা কাজ ত তাহারাই করিতে সমর্থ,—বর্ষীয়ানেরা নহে। বর্ষীয়ানেরা ভাল আর মন্দের বিচার করিতে পারেন, শ্রমের ঝুঁকি নিতে পারেন না।

*　　*　　*　　*　　*

কে কোন্ নামজাদা লোক আমাদের অনুষ্ঠানে আসেন নাই, কে কোন্ বিখ্যাত বক্তা উৎসবের সভায় ভাষণ দেন নাই, ইহা দিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎকে বিচার করিও না। কে কোন্ অখ্যাত ব্যক্তি আমাদের অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলেন, কে কোন্ অপটু বক্তা মনের আবেগে সভামঞ্চে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা দিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে বিচার করিও। যাহাদের চেন এবং জানো, হয়ত তাহাদের দ্বারা তোমাদের বল বাড়িবে না, যাহাদিগকে কখনো চেন নাই, কখনো জানিতে না, সেই অগণিত মানুষগুলির মধ্যেই তোমাদের কর্ম্মের সম্ভাবনা, সাফল্যের সম্ভাবনা, বলবর্দ্ধনের সম্ভাবনা লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সত্যকে স্বীকার কর।

*　　*　　*　　*　　*

হিন্দু সমাজটাকে ধ্বংস করিবার অভিযোগ অতীতে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তির বিরুদ্ধেই আসিয়াছে। তাঁহারা হিন্দুসমাজকে সত্যই ধ্বংস

করিয়াছেন, না রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার বিচার ত ইতিহাস করিবে। আমাদিগকে সহিষ্ণুতার সহিত কালপ্রতীক্ষা করিতে দাও।

আশীর্ব্বাদক

ইতি—

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

কাটিহার (পূর্ণিয়া)

১৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯

(১লা মার্চ্চ, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা চাহিয়াছিলে যেন আমার ও সাধনার ভ্রমণ-কালীন বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দেই, যাহাতে তোমরা নানা সংবাদপত্রে খবরগুলি ছাপাইয়া কিছু জনহিত সাধিতে পার। কিন্তু অধিকাংশ খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেখিতে পাই হা-হুতাশ যে, একদল লোক কেন নানা স্থানে মদ্যপান নিবারণের জন্য সভা, সমিতি, সম্মেলন আদি করিয়া সুসাহিত্যিক প্রতিভাধরদের এবং সুনির্দ্দিষ্ট দেশনেতাদের সুখনিদ্রায় উৎপাত ঘটাইতেছে। নিজ চ'ক্ষে যদি এই সকল সম্পাদকীয় রচনা স্বয়ং পাঠ না করিতাম, তবে বর আলাদা কথা ছিল। দেশের পত্রিকা-পরিচালকদের নিদারুণ রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গোরক্ষা সম্পর্কে কথা ছাপাইতে গেলে ইহাদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না কিন্তু নবযুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ প্রচলন করিয়া দেশের হিতসাধনে ব্রতী হউন বলিয়া প্রবন্ধ লিখিলে সব চেয়ে সমাদর

কাগজখানা সেই প্রবন্ধটী লুফিয়া লয়। এইরূপ রুচিবিকৃতি যেই দেশে স্বাধীনতার অমৃতময় ফল-স্বরূপে ঘটিয়াছে, সেই দেশে আমার মতন সামান্য ব্যক্তির তত্ত্বকথার স্থান কি করিয়া সংবাদপত্রে আশা করিতে পার? আমি ত গত বারোটা দিন তারস্বরে বলিয়া যাইতেছি যে, ধর্ম্মের নেশায় দেশের যত ক্ষতিই করিয়া থাকুক, মদের নেশা তাহার দশগুণ, বিশগুণ, পঁচিশ-পঞ্চাশ গুণ ক্ষতি করিতেছে। ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার যে বিদ্বেষপূর্ণ চর্চ্চা হইতেছে, তাহা আংশিক ভাবে হইলেও নির্ম্মূল করিবার জন্য আমি প্রতিটি সভাস্থলে সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকদের নিয়া জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছি। এগুলিও ত পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়েরা হয়ত রুষ্ট দৃষ্টিতেই দেখিবেন। সাধনা প্রতিটি বক্তৃতামঞ্চ হইতে বজ্রসম বাণী বর্ষণ করিতেছে এই বলিয়া যে, যে দেশে স্বাধীনতা আসিবার পরেও নারীনিগ্রহ চলিতে থাকে এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার পৌরুষ কাহারও থাকে না, সে দেশ মানুষের দেশ নহে, অসভ্য জানোয়ারের দেশ। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কয়খানা সংবাদপত্র এ সব সংবাদ প্রকাশ করিতে খুশী মনে রাজি হইবেন, বল ত! তার চেয়ে এসব অর্থলোভী পত্রিকাগুলির সহায়তা ব্যতীতই আমরা নিজেদের বলে কে কোথায় কতটুকু কাজ করিয়া যাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা সঙ্গত মনে করি। সংবাদপত্র মারফতে আমাদের প্রচারের আশা ছাড়িয়া দিয়া তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ কণ্ঠ ও ওষ্ঠকে সরব কর, তোমরা প্রতিজনে বিবেক-প্রবুদ্ধ হইয়া কথা বলিতে সুরু কর। কলিকাতার সবচেয়ে বেশী সমাদৃত পত্রিকাখানার গ্রাহক-সংখ্যা এক লক্ষ হইলে হইতে পারে। কিন্তু তোমরা তোমাদের তিন চারি লক্ষ ওষ্ঠের দ্বারা কি তাহা অপেক্ষা

অধিক প্রচার-কার্য্য করিতে পার না ? পত্রিকায় নাম প্রচারি হইবার দরুণ যে যশোলাভ ঘটিল, তাহা আমার লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ কর্ত্ত অদম্য সাহস ও নিরপেক্ষ উদ্যম লইয়া পালন করিয়া যাইতে থাক কর্ত্তব্য-পালনই বড় কথা, নামযশ-লাভ বড় কথা নহে।

মালদহ, পুরাতন মালদহ, আরাপুর, গাজোল, পতিরাম, বালুরঘাট গঙ্গারামপুর, ধনকোল, রায়গঞ্জ প্রভৃতি প্রতিটি স্থানে সহস্র সহস্র সম্ভ্রম নত মানুষের অন্তরের স্পর্শ পাইয়া বুঝিতেছি যে, তোমরা যদি প্রতিস্থানে আমাদের ক্ষুদ্র "প্রতিধ্বনি" খানা নিয়া হাজির হও, তাহা হইলে তোমরা অসাধ্য-সাধন করিতে পার। তোমরা যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে প্রতিধ্বনির গ্রাহক-সংখ্যাও আগামী দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষের কোঠা ছাড়াইয়া যাইতে পারে। "প্রতিধ্বনি"তে আমরা আমাদের ভ্রমণ-বিবরণ বহুলশঃ প্রচার করি না কিন্তু আমাদের আদর্শের বাণী ইহাতে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে প্রচারিত হইতেছে। তোমরা সেই আদর্শের সহিত নিজেদিগকে যুক্ত করিতে চেষ্টা কর। তাহার সুফল কল্পনাতীত শুভদ।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে "শাশ্বত বাণী", মেদিনীপুরের রাওয়াতে "জাগরণী", বাঁকুড়ার কুস্থলিয়াতে "বাঙ্ময় স্বরূপানন্দ", শিলিগুড়িতে "অখণ্ড-সমাচার", ভূবনেশ্বরে "AKHANDA-BANI" প্রমুখ যে সকল স্বল্প-সংখ্যায় প্রচারিত পুস্তিকা বা প্রচার-পত্রিকা চলিতেছে, তাহারও সামূহিক ফল বড় সামান্য নহে। তোমরা প্রতি স্থানে নিজ নিজ কণ্ঠ এবং লেখনীকে উদ্যত কর। যে যতটুকু পার, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে কাজ সুরু কর। তোমাদের নিজস্ব বলের চেয়ে পত্রিকাওয়ালাদের নিক্তির ওজনে বণ্টিত অনুগ্রহের বল বেশী নহে। তোমরা আত্মবিশ্বাস হারাইও না।

গুরুতর পীড়াগ্রস্ত শরীর লইয়া আমি, সাধনা ও অসীম কাজ করিয়া যাইতেছি। অন্য ত স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে অসীমকে কলিকাতায় পাঠান হইতেছে। প্রেমাঞ্জন পুপুন্কী হইতে বারাণসী গিয়াছিল, আমার টেলিগ্রাম পাইয়া কাটিহার আসিয়া গিয়াছে। রণেন্দ্র বারাণসী হইতে পুপুন্কী চলিল।

সহস্র অসুবিধার মধ্যেও পুপুন্কীর কাজ আমরা বন্ধ করিয়া দেই নাই। এখনো প্রতি সপ্তাহে শুধু মজুর-খরচ তিনশত টাকার ঊর্দ্ধে যাইতেছে। উপকরণাদি সংগ্রহের ব্যয় আলাদা। নানা স্থানের মণ্ডলীগুলির এখন এই একটা জরুরী বিষয়ে সক্রিয় হওয়া দরকার, যেন, আমরা ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী আট জন নির্লোভ চরিত্রবান্ যোগ্য শিক্ষক পুপুন্কীতে পাইয়া যাইতে পারি। অকর্ম্মণ্য লোক আনিয়া পুপুন্কীকে একটা পিঁজরাপোলে পরিণত করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে পুপুন্কীতে পড়াশুনা হইবে মাত্র পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম মানের। বিস্তারিত বিবরণ আলাদা বিজ্ঞাপনে দিয়াছি, সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিও।

ভারতের সুদীর্ঘকালের শিক্ষা-পদ্ধতি ভিখারী আর ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ, গান্ধী, তিলক আদি একান্তই ব্যতিক্রম-স্থল। এই দুঃখেই মরিয়া যাইতেছি যে, এখনো দেশের চিন্তাশীল লোকেরা শিক্ষা-জগতের প্রকৃত সমস্যা চিনিতে পারেন নাই। আমরা কর্ণ-পটহ-বিদারণকারী অত্যুচ্চ আওয়াজ তুলিয়া লোককে কেবলি বলিয়া আসিয়াছি,—"প্রেম দাও, ভালবাস" কিন্তু নিজেদের দৃষ্টি-দৈন্যবশতঃ দেখিতেই পাই নাই যে, কি সেই অপূর্ব্ব কৌশল, যাহার বলে প্রাচীন ঋষি নিজের ঘরের অন্ন দিয়া বিদ্যার্থীদিগকে

প্রতিপালন করিতেন আর রাজার ছেলে ও প্রজার ছেলে উচ্চ-নী
বোধ পরিহার করিয়া এক সঙ্গে অন্নার্জ্জন আর বিদ্যার্জ্জন করিয়া যাই
দৃষ্টিদৈন্যবশত আমরা দেখিতে পাই নাই যে, উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রে
নিম্নতর শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াশুনায় অগ্রজযোগ্য সহায়তা করি
প্রথমোক্তের শিক্ষা কত সহজে পাকা হইয়া যায় আর শিক্ষক-সংখ্যা
নিদারুণ সমস্যা চমৎকার ভাবে মিটিয়া যাইতে পারে। বাঁচিতে হইবে
কেবল "প্রেম, প্রেম" বলিয়া অর্থহীন চীৎকার করিয়া কোনও লা
হইবে না, প্রেমকে বাস্তব করিবার জন্য নিজ হাতে নিজের অন্ন অর্জ্জনে
শিক্ষা দিতে হইবে, এরূপ শিক্ষাদান সুসম্ভব করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদ

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

মালবাজার (জলপাইগুড়ি)
২৪ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭
(৮ মার্চ্চ, ১৯৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—; আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রতিবার ভ্রমণেই আমি মানুষের প্রেমকোমল মনের অফুরন্ত মধুময়
স্পর্শ পাইয়া পুলকিত হই। এবার তাহার পরিমাণটা বেশী, এবার
তাহার আস্বাদনের গভীরতাটা তার চেয়েও বেশী। তোমাদের সকলকে
তোমাদের প্রীতিশীতল সেবাকোমল মূরতিতে দেখিতে পাইয়া অনেক
সময়ে আমার মনে হইয়াছে যে, আমার শত জন্মের প্রেমের সাধ যেন

পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তোমরা তোমাদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা নিয়া এমনি করিয়া নিয়ত পরিবর্দ্ধনশীল থাক, আমি অকপটে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

প্রকৃত ভালবাসা যদি মানুষ কখনো কাহাকেও বাসিতে পারে, তাহা হইলে ঐ একটী মানুষকে ভালবাসার দরুণই তাহার সেই ভালবাসা বিশ্বজগন্ময় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। একজনকে যে ভালবাসে, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই ভালবাসিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত ভালবাসার স্বভাব-ধর্ম্মই এই যে, ইহা একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা বিশ্বভুবন জুড়িয়া কেবলই বিস্তার পাইতে থাকে।

ভালবাসা সম্পর্কে আমার সংজ্ঞা ইহা।

সুতরাং বুঝিয়া দেখ যে, আমি তোমাদের প্রতিজনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখি।

অশেষ প্রীতি, অতুল তৃপ্তি, অমলিন স্নেহ ও অফুরন্ত স্নিগ্ধতা নিয়া তোমাদের স্থানটী পরিত্যাগ করিয়াছি, এই সংবাদ তোমাদের ওখানকার প্রত্যেককে জানাইয়া দাও। আমি আলাদা করিয়া জনে জনে আর পত্র দিতে পারিলাম না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

মালবাজার

২৪ ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধৃতং প্রেম্ণা

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সুখের কারণ এই যে, দারুণ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখে পড়িয়াও তুমি জীবিকার সন্ধানে এমন স্থানে যাইতে চাহিতেছ না, যেখানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবার সুযোগ নাই। অবশ্য, যেখানে তোমার সমভাবের ভাবুক বা সমমতের সাধক কেহ নাই, চেষ্টা করিলে সেখানেও সমবেত অখণ্ড-উপাসনার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে সৃষ্টি করিয়া লওয়া যায় কিন্তু কল-কারখানার কাজ করিতে গেলে বা ঈশ্বরদ্রোহী মনিবের চাকুরী করিতে গেলে, উপাসনার অনুকূল পরিবেশের মধ্যেও হয়ত তোমার উপাসনাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে না। দুর্গাপুর, জামশেদপুর প্রভৃতি ইস্পাত-নগরে এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু জামশেদপুরের উপাসকেরা বিপরীত পরিস্থিতিকে সৎসঙ্কল্প ও নিষ্ঠার বলে পদানত করিয়াছে এবং দুর্গাপুরের কিছু কিছু উপাসক নিজ নিজ আদর্শকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিয়া পরিস্থিতির পরাজয় সাধনে ব্রতী হইয়াছে। রাউরকেলা বা ভিলাই সম্পর্কে এমন কোনও আশার বাণী শুনাইতে পারিলাম না। সেখানে তোমাদের সমসাধক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাহারা নিষ্ঠাবান্ নহে বা আদর্শের প্রতি তাহাদের অনুরাগের কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ আজ পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় নাই। নতুবা কত আগে সেখানে আমার ভ্রমণ-তালিকা হইতে পারিত এবং ইহার ফলে প্রতিকূল পরিবেশ স্বভাবতই অনুকূল হইত। তুমি যদি প্রথমোক্ত দুইটী ইস্পাত-নগরীর যে-কোনও একটীতে জীবিকার সন্ধান পাও, তাহা হইলে তোমার উপাসনায় অনুরাগ চর্চ্চার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। তুমি যদি শেষোক্ত দুইটী ইস্পাত-নগরীর যে-কোনও একটীতে জীবিকার সন্ধানে যাও, তাহা হইলে উপাসনা তোমাকে একা একা করিতে হইবে,

তোমার গুরুভাইভগিনী রূপে পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে বা অধিক ব্যক্তিকে সমবেত উপাসনার আসরে পাইবে না।

ঠিক এই অবস্থাটী গোরক্ষপুরে হইয়াছিল। প্রখ্যাত দর্শনাধ্যাপক ও গোরক্ষপুর কলেজের অধ্যক্ষ অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার গোরক্ষপুর আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গুণিতেছিলেন কিন্তু তোমাদের যে কয়টী গুরুভাই ঐ সহরে গণ্যমান্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও সমবেত উপাসনার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারে নাই, একমাত্র তাহাদের অপদার্থতা ভাবিয়াই আমি গোরক্ষপুর কদাপি কোনও প্রগ্রাম করি নাই। আমার চিরক্ষমাশীল সহশক্তিসম্পন্ন মনেরই যখন এই অবস্থা, তখন কোনও স্থানে উপাসনার সুযোগ না থাকিলে তোমার মনটার কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি অনুমান করিতে পারি।

যাহা হউক, এই বিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হইয়া তুমি জীবিকার প্রকৃত সুযোগ কোথায় ঘটিতে পারে, সেই বিষয়ে অধ্যবসায়-পরায়ণ হও। তোমার বর্ত্তমান চাকুরীর সঙ্গে মুদি দোকান করা সঙ্গত হইবে কি না হইবে, তাহা এখনি বলিতে পারিতেছি না। ব্যবসায়ে যেমন লাভের সম্ভাবনা আছে, তেমন ক্ষতির ঝুঁকিও থাকিতে পারে। ব্যবসায় করিলে সতর্ক ভাবে করিও যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয়। বাকীর কারবার বড় মারাত্মক।

ভাইকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য যে প্রয়াস পাইতেছ, তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সৌভ্রাত্র্য এই দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে কিন্তু উঠিয়া যাইতে দিলে ত চলিবে না! পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও গুরুর প্রতি মর্য্যাদাবোধ এদেশের কেন, সম্ভবতঃ প্রকৃত সভ্য সব দেশেরই, গৌরবাবহ ঐতিহ্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

মালবাজার

২৪ ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমস্ত পরিবারই যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পরিবারস্থ দুই একজনকে জোর করিয়া সুস্থ হইতে হয় এবং যাহাতে অন্যান্যেরা একে একে সুস্থ হইয়া উঠে, তার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। একটা ঘর প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে সর্ব্বাঙ্গে বিধ্বস্ত হইলে যেমন তাহার সর্ব্ব-স্থানের মেরামতি কাজ যুগপৎ সম্ভব হয় না, আগে একটা কি দুইটা খুঁটিকে পোক্ত করিয়া নিতে হয়, তারপরে ধরিতে হয় দুই একটা পাইর বা পাল্লার কাঠ, এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ জানিবে। একটা পরিবার সম্পর্কে যে কথা সত্য, কোটি কোটি জনতার আধার একটা রাষ্ট্র সম্পর্কেও সেই কথা সত্য। আগে জানিয়া নিতে হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপদ অস্তিত্বের প্রধান খুঁটিটি কি এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে শক্ত করিয়া প্রোথিত করিবার উপায়টী কি।

পত্রে যে বিবরণ দিয়াছ, তাহা পাঠে তোমার জন্য বেশ একটু উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। উদ্বেগ এই জন্য নয় যে, পরিণামে হারিয়া যাইবে, জিতিতে পারিবে না, উদ্বেগ এই জন্য যে তোমাকে দুরন্ত দুঃসাহস নিয়া বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লড়াই দিতে হইবে। জয় তোমার যে হইবেই, ইহাতে আমি কণামাত্র সংশয়ও পোষণ করি না।

জগতে নিষ্ঠারই জয়, প্রতিভা সকল সময়েই নিজের মূল্য আদায় করিতে পারে না। কত কত প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এই জগতে

যে অকালে ছাই হইয়া মহাশূন্যে মিলিয়া গিয়াছে আর কত কত প্রতিভাহীন নিষ্ঠাশীল একান্ত অধ্যবসায়ী ব্যক্তি অজানা মহাশূন্যে নিজের জন্য গৌরবমণ্ডিত অক্ষরেখা আবিষ্কার করিয়া নিতে সমর্থ হইয়াছে, কেহ তাহার ইতিহাস লিখিতে পারে নাই বলিয়াই কথাটা মিথ্যা নহে। তুমি নিষ্ঠাশীল হও, নিজের মতে ও নিজের পথে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী হও, আদর্শের পরাজয়কে অসম্ভব জ্ঞান করিয়া কোমরে শক্ত করিয়া গামছা বাঁধ। "মরিব না" বলিয়া জিদ কর এবং মৃত্যুঞ্জয়ী সৎসাহস লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। আমি যে একটী মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে আমার সঙ্গ হইতে চ্যুত করিব না, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিয়া দৃঢ় পদে অগ্রসর হও।

মিথ্যা তোমাকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে বলিয়া মনে করিও না যে, মিথ্যার বল খুব বেশী। মিথ্যার সব চেয়ে বড় বলটী এই যে, সে সকলকে আত্মপ্রত্যয়হীন করিয়া দিতে চাহে, চাতুরীর মায়ায় সে ধীমান পুরুষকেও ধোকা খাওয়াইয়া দেয়। শক্ত হইয়া সত্যের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাক, মিথ্যার চাতুরী অচিরে খতম হইবে।

কন্যা-বিবাহের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া সৎপাত্র অন্বেষণে রত থাক। এক সময়ে না এক সময়ে ঠিক তোমার পছন্দমত পাত্রটী পাইয়াই যাইবে। কন্যাকে স্বয়ম্বরে বাধ্য না করিবার জন্যই তোমাকে এই পরিশ্রমটুকু করিতে হইবে। স্বয়ম্বর ক্ষত্রজনোচিত এক বিরাট উৎসবময় আড়ম্বর হইলেও ইহার ফলে সকল কন্যাই যে জগতে সুখী হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। পিতামাতা পাত্রের কুল-শীল দেখিয়া, যোগ্যতা, বিদ্যাবত্তা ও চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যতগুলি বিবাহ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই কন্যাটীর পক্ষে যে শুভদায়ক হইয়াছে, একথা অস্বীকার

কন্যার মত কারণ দেখি না। দুশ্চিন্তা না করিয়া পাত্র খোঁজ। পাত্র মিলে না বলিয়া এই ব্যাপারে অবহেলা করিয়া কন্যাকেই নিজ বর খুঁজিয়া বাহির করিতে বাধ্য করিও না। এই বিষয়ে তোমার পত্নী তোমাকে বারংবার পীড়াপীড়ি করিতেছে বলিয়া তাহার উপরে বিরক্ত হইও না। তাহার এই অত্যাগ্রহের সঙ্গত কারণ আছে।

স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলে ঈশ্বরানুগত হও। পরমেশ্বরের শ্রীচরণে আনুগত্যের অনুকূল জীবনাদর্শের সঙ্গে সকলে যুক্ত হও। স্বামী আর স্ত্রীই মাত্র তাহা করিলে আর পুত্রকন্যাদিগকে নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিবার জন্য সীমার বাঁধন ছিঁড়িয়া দিলে, ইহা এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে সহস্র জনের বাহবা আকর্ষণ করিলেও সন্তানের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে কিনা, ভাবিয়া দেখ। যে পরিবারে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা সকলেই একটী নির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুগত, সেই পরিবারের মধ্য দিয়া বৃহত্তর শক্তির এবং মহত্তর মহিমার আবির্ভাবের একটা প্রবল সম্ভাবনা যে জন্মে, এ কথা বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

মালবাজার
২৪ ফাল্গুন, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ৯ই মাঘের পত্রখানার খাম অদ্য খুলিবার অবকাশ হইল। কয়েক ঘণ্টার জন্য মৌন পালন করিতেছি। তাই মানুষের হাজার ভিড়ের মধ্যেও খান ত্রিশেক পত্র পড়িবার সুযোগ হইল। পত্রোত্তরের দেরীর জন্য দুঃখ করিও না।

পঞ্চাশ বিঘা চাষের যোগ্য জমি আছে তবু রুক্ষ মরুভূমির মতন ফেলিয়া রাখে, এমন মানুষ এই যুগে আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। তেমন এক সংসারের তুমি গৃহিণী, সুতরাং তোমার উর্ব্বর মনকে নানা পরিস্থিতির তাড়নায় মরুভূমি হইতে হইয়াছে জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কিন্তু মা, স্বামী পাষাণহৃদয়, এই যুক্তিতে তুমি পতিগৃহ ছাড়িয়া যাইতে পার না। তোমার পিতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও বিপন্ন, এই যুক্তিতে তাঁর সেবার জন্য পিত্রালয়ে যাওয়ার অধিকার, প্রয়োজন এবং সঙ্গতি নিশ্চয়ই তোমার আছে। যাহা করিবার, প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া তাহা করিবে, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ, বিরক্তি, ক্রোধ বা আক্রোশ বশত করিও না।

যে ব্যক্তি কোনও একজন গুরুর নিকট একটী মন্ত্রে দীক্ষিত, যিনি গৃহে ইষ্টবিগ্রহ রাখিয়াছেন পূজা করিবার জন্য, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ যিনি সাড়ম্বরে করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর উপরে কেন এত নিষ্করুণ হইলেন যে কারণে অকারণে শাসন করিয়াই নিজ পৌরুষের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি অতিরঞ্জন না করিয়া থাক, তবে মনে করিতে হইবে যে তাঁহার মনের ভিতরে কোনও রোগ আছে। যিনি নেশা-ভাং করেন না, পরনারীতে আসক্ত নন, জুয়া খেলেন না বা অন্য কোনও পাপাচারে আসক্ত নন, এমন স্বামীর এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক নহে। তোমার বিবরণেই দেখিতে পাইতেছি যে,

তোমার শ্বশুরও তোমার শ্বাশুড়ীকে উৎপীড়ন করিতেন, যাহার ফলে সেই হতভাগিনী আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় অনুমান করা চলে যে, বাল্যকালে পিতার আচরণে নানা রূপ নিষ্ঠুরতা দেখিতে দেখিতে তোমার স্বামীর মনটিও নিষ্ঠুর হইয়াছে, তাহার মন রুগ্ন। সেই রুগ্ন মনটীর চিকিৎসা ত' মা তোমাকেই করিতে হইবে। ইহার চিকিৎসা তুমি না করিলে আর কে করিবে? তুমি তাহার প্রতিটি অবস্থার প্রতিটি ব্যবহার যেমন করিয়া জান, অন্য আর কে তাহা জানিতে পারিবে? স্ত্রীর কর্ত্তব্য শুধু স্বামীর বংশটী রক্ষা করাই নহে, শুধু স্বামীর সন্তানটীকে প্রসব করাই নহে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর রুক্ষ রুদ্র রুগ্ন মনটীরও পরিবর্ত্তন-সাধন করা। স্বামী তোমার সহিত অকথনীয় অসদ্ব্যবহার করিতেছেন বলিয়াই তাহার প্রতি তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিবে না, ইহা হইতে পারে না। তিনি যে তোমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যগুলি যোগ্য ভাবে পালন করেন নাই, এজন্য নিশ্চয়ই তিনি নিন্দনীয় কিন্তু তাঁহাকে মনের দিক দিয়া রুগ্ন ও অসহায় জানিবার পরেও তুমি তাহাকে অদৃষ্টের হাতে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়িবে কি করিয়া? ভদ্রলোক অসদ্দৃষ্টান্তের ফলে বাল্য হইতেই এবপ্রকারের মনোবিকারে ভুগিতেছেন, যাহার ফলে অত্যাচার করিবার জন্য তোমাকে হাতের কাছে না পাইলে পুত্রকন্যার প্রতি অত্যাচার করিবেন এবং তাহারাও দূরে সরিয়া গেলে নিজের উপরে নিজে প্রতিশোধ লইবেন। এমন পাগলকে সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে, তাঁহার রোগারোগ্যের প্রয়োজনে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কালের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়া বিরহের সৃষ্টি দ্বারা অনুকূল বাতাবরণ গড়িবার চেষ্টা করিতে পারে।

যেখানে তোমার সঙ্গে তাঁহার মতভেদ, খুব সম্ভবতঃ তাঁহার দারুণ ক্রোধের হঠাৎ-উদ্দীপ্তির কারণটীকে সেইখানে খুঁজিয়া পাইবে। মত-ভেদের কারণ ঘটিলে প্রবল বিক্রমে প্রতিবাদ না করিয়া ক্রুদ্ধ স্বামীর দুই চারিটা অসহিষ্ণু গর্জ্জন ধীর সংযত মনে সহিয়া লইলে কি দোষটা হয়, বল ত' মা! সহিতে না জানিলে সংসারে কেহ অপরকে নিজের বশ করিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর বশে থাকিলেই স্ত্রী স্বামীকে বশে আনিতে পারে। অন্ততঃ চেষ্টাটুকু এই রাস্তাতেই চলা উচিত। একজন বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলে অন্য জন পরশু হস্তে মস্তকচ্ছেদনে ছুটিয়া আসিতে ত পারেই। তোমাকে সহিষ্ণু হইতে হইবে। আর হইতে হইবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বিশ্বাস থাকিলে সব কাজ করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

মালবাজার

২৪ ফাল্গুন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১লা মাঘ তারিখের পত্রখানা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার শিষ্য নহ, তবু আমাদের সমবেত উপাসনা তোমার ভাল লাগিয়াছে। ইহা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কারণ, এই সমবেত উপাসনার আবির্ভাব শুধু আমার শিষ্যদের কল্যাণের জন্য নহে, যাঁহারা আমার শিষ্য নহেন, কদাচ আমার শিষ্য হইবেন না, এমনকি

যাঁহারা আমাকে একটা তুচ্ছ মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে অরুচিগ্রস্ত বা অক্ষম হইবেন, এই সমবেত উপাসনা তাঁহাদেরও সকলের কুশল সম্পাদনের জন্য। ইহা কোনও সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নহে বলিয়াই ইহাতে পূজার বেদীতে আমার প্রতিচিত্রটী রক্ষিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব আমার শিষ্য হউক, এইরূপ কোনও দুরভিসন্ধি আমার মনের কোণেও নাই বলিয়াই সমবেত উপাসনার মতন এমন নির্ভেজাল সুন্দর জিনিষটী একদা আমার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারিয়াছে। সমবেত উপাসনা যখন তোমার ভাল লাগিয়াছে, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিয়া ইহার সাপ্তাহিক অনুশীলন তুমি যে নিশ্চয়ই করিবে, এইরূপ আশা পোষণ করিতেছি। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অতিরিক্ত চর্চ্চা আমাদের উদার মধুর ধর্ম্মভাবকে কোণঠেসা ও কর্কশ করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের ইহা গ্লানি। ধর্ম্মের ইহা অসম্মান। পৃথিবীর সকলকে লইয়া ঈশ্বরের কাছে নত হইব, এই সাধই প্রকৃত ধার্ম্মিকে সাজে। আমি চাহি যে প্রেমের ডোরে নিখিল ভুবন বাঁধা পড়ুক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

নিউ মাল রেল ষ্টেশান
২৫ ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৭৯
(৯-৩-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রত্যেকেই চাহিতেছ যে, আমি তোমাদের স্থানটীতে অচিরে একটী প্রগ্রাম করি। জন্মাষ্টমীর পরেই কোনও সুবিধাজনক সময়ে তোমাদের ওখানে একটী প্রগ্রাম করিবার আমার ইচ্ছাও আছে কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা ত' না বলিয়া পারিতেছি না। লোকে আমার চেহারাটা দেখিবে বা বক্তৃতা শুনিবে, ইহার মধ্যে প্রকৃত সার্থকতা কোথায় কতটুকু কি আছে, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমার আগমনের ফলে বহুসংখ্যক মানব-মানবী যদি এই সঙ্কল্পে স্থিতিশীল হয় যে, তাহারা আজীবন জগতের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু পরার্থপর কর্ম্মে নিজেদের নিয়োজিত রাখিবে, তবেই না আমার গমনের দ্বারা তাহারা, তাহাদের অঞ্চল, দেশ, জাতি বা জগৎ লাভবান্ হইবে। আমি আমার নিজের লাভের দিকে তাকাইয়া একটী কাজও করিতে চাহি না কিন্তু ইঁহারা যদি পরার্থপরায়ণ মঙ্গলকাজের সহিত নিজেদের যুক্ত করিবার আগ্রহে উদগ্রীব না হন, তবে আমার দেশ-ভ্রমণ ত একটা বিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। আমার দিক দিয়া তাহা হইবে একটী পণ্ডশ্রম, তোমাদের দিক দিয়া তাহা হইবে হুজুগ-সম্বল একটী বিকট ব্যসন। দেশ, জাতি বা জগতের স্থায়ী শুভ কিসে কতটা হইবে, তাহার দিকে প্রতিজনে দৃষ্টি দাও, আমাকে লইয়া মাতামাতি করার ভিতরে কোনও বিশেষ মহত্ত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

আমার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি জনকে আমার জগন্মঙ্গল-সমর্থক বাণী-সমূহ নিয়া ঘরে ঘরে যাইতে হইবে এবং জনে জনের কাণে তাহা প্রীতিমধুর কণ্ঠে শুনাইতে হইবে। এই কাজটী যদি না করিতে পার, তবে তোমাদের দ্বারা প্রকৃত কাজ কিছুই করা হইবে

না বলিয়া জানিও। আমাকে পাথেয় ব্যয় না দিলেও আমি সর্ব্বত্র যাই, আমাকে অভ্যর্থনা না জানাইলেও আমি সর্ব্বত্র কাজ করি, আমাকে পার্থিব কোনও সহায়তা না করিলেও আমি কোনও স্থানের লোকদের উৎসাহকে ছোট করিয়া দেখি না। কিন্তু মানুষের মনে যদি জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পটী স্থায়ী ভাবে না বসিল, তবে আমার গমন, প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রমদান সবই যে ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল, ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। আমার নামে জয়ধ্বজা উড়াইয়া তোমরা আমাকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না, আমি জগজ্জনের জয় চাই, নিজের জয় চাই না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

নিউ মাল রেল ষ্টেশন

২৫ ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১৮ই জানুয়ারীর পত্রের জবাব আজ নিউ মাল রেলষ্টেশনে ট্রেণের প্রতীক্ষায় থাকা কালে প্লাটফরমে বসিয়া মার্চ্চের নয় তারিখে দিতেছি। আমি কাজের লোক, কদাচ বসিয়া কালহরণ করি না তথাপি তোমাদের অগণিত পত্রের জবাব দেওয়া হইয়া ওঠে না। তাহার একটা কারণ আমার নানাবিষয়ের সাধ্যাতিরিক্ত কর্ম্মব্যস্ততা। অপর কারণ এই যে, তোমরা অধিকাংশই বিনা প্রয়োজনে পত্র লেখ এবং

পত্রে অনেক অনাবশ্যকীয় কথার অবতারণা কর। একদল লোকের মধ্যে যেমন আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎকট বিলাসিতা দেখা যায়,—ইহারা গাটের পয়সা খরচ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে আমার বক্তৃতা শুনিতে যায়, কিন্তু একটা বক্তৃতারও একটা কথা মনে ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হয় না,—একদল লোকের মধ্যে তেমন আমার পত্র পাইবার জন্য কল্পনাতীত শখ দেখা যায়, ইহারা বৎসরে পঞ্চাশ খানা পত্র পাইলেও সন্তুষ্ট হয় না, আরও দুই চারিখানা পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লেখে। আমি মরিয়া যাইবার পরে হয়ত দেখা যাইবে যে, এই সব লোকদের ঘরে ঘরে আমার লেখা ঝুড়ি ঝুড়ি পুরাতন পত্র রহিয়াছে কিন্তু ইহারা কেহই জীবনে আমার একটা উপদেশের সম্মান রাখে নাই, একটা নির্দ্দেশ পালন করে নাই, একটা শুভ-প্রত্যাশাও পূরণ করে নাই। তথাপি যতটা পারি, ততটা পত্রের উত্তর লিখি, সাধ্যে যতটা কুলায়, ততটা কালী, কলম ও ডাক-টিকেট খরচ করি। তোমাদিগকে পত্র লিখিতে লিখিতে দৃষ্টিশক্তিটুকুও প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিলাম, তবু এ পত্র লেখার বিরাম নাই। এই যে আমি নিউ মাল রেলষ্টেশনের পরিচ্ছন্ন চত্বরে কম্বল বিছাইয়া সুটকেসটীকে টেবিল করিয়া অফুরন্ত পত্র লিখিতেছি, তাহা কি খুব নির্ব্বিঘ্ন একটা কাজ? শতাধিক ভক্ত নরনারী, আরও কিছু কৌতূহলী জনতা চারিদিক বেষ্টন করিয়া গুঞ্জন তুলিতেছে, কত জনের কত রকমের কথা আর বার্ত্তা, তার মধ্যে মেইল ট্রেণের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে আমার লেখনী। এই লেখা কি সলিলে দলিল লেখার মতন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে না? তোমরা কোথাও কেহ কিছু মাত্র কাজ করিবে না, কেবল চাহ পত্র আর পত্র। ইহা ক্লেশকর কিনা, বিবেচনা করিও।

তোমাদের ঐখানে তোমাদের প্রভাবাধীন স্থানে আঠারো বিশটী অখণ্ডমণ্ডলী ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার পুনর্জ্জীবন প্রয়োজন। কিন্তু তোমাদের স্থানীয় হোমরা-চোমরাদের কাহাকেও এই কাজে লাগাইতে পারিতেছ না। তাই অনুরোধ করিয়াছ যে, আমি যেন এই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিজনকে এক এক খানা করিয়া পত্র দিয়া তাহাদের ভিজা দেয়াশলাইএর কাঠিতে আগুন ধরাইয়া দেই। কিন্তু বাবা, যে ইঞ্জিনে কয়লাই নাই, সেই ইঞ্জিনে ফায়ারম্যান যদি কেবল লোহার শলাকা দিয়া খোঁচাইতে থাকে, তবে এই খোঁচানির ফলে কি ষ্টীম বাড়ে? বড় লোক দেখিয়া, ধনী লোক দেখিয়া, বিদ্বান ও প্রতিষ্ঠাবান্ দেখিয়া কতকগুলি লোককে তোমরা তোমাদের নেতা হইবার যোগ্য বলিয়া ভ্রম করিয়া ধরিয়া লইয়াছ। কিন্তু তোমাদের সহস্র প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ করিয়া ইহারা অচল পর্ব্বতের ন্যায় নির্জ্জীব বিরাটত্বে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে পত্র লিখিয়া আমি কি লাভ লভিব? তার চেয়ে বরং ছোটদের কাছে যাও, অনাদৃতকে আদর কর, অসম্মানিতকে সম্মান দাও, অবজ্ঞাতকে স্বীকার কর, অবহেলিতকে আহ্বান জানাও এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করা যাইবে, তাহাদিগকে নেতৃত্বে অভিষিক্ত কর। ক্ষত্রিয় রাজার যখন ক্ষাত্রবীর্য্যের অবসান হইল, তখন কি একদা বাংলার মানুষ কৈবর্ত্তকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে নাই?

যাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু কাজে আগ্রহ নাই, তাহারা কেহ রাজা, কেহ জমিদার, কেহ ধনী, কেহ মহাজন, কেহ অধ্যাপক, কেহ অধ্যক্ষ, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ ব্যাপারী, কেহ শাসনকর্ত্তা, কেহ বিচারক বলিয়াই তোমাদের নেতা হইবার যোগ্য, ইহা মনে করিও না।

নিরভিমান চিত্তে যে সকলকে সেবা দিবার জন্য সর্ব্বদার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত, নেতৃত্বের পবিত্র অধিকার একমাত্র তাহার।

কথাগুলি আমি তোমাদিগকে কত বার যে কত ভাবে বলিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কথাগুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ছোটদের লইয়াই কাজ সুরু কর। ছোটদের দিয়াই কাজ চালু রাখ। জগন্নাথের রথের দড়ি রাজায় ধরিল, না প্রজায় ধরিল, এ বিচার অবান্তর। রথকে চালু রাখিতে হইবে, এইটাই আসল কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

নিউ মাল রেল ষ্টেশান

২৫ ফাল্গুন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলী ছোট হইলেও ভাবিবার কিছু নাই। আজ যে ছোট, কাল সে বড় হইতে পারে না, তাহা নহে। অখণ্ডমণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটিকে সর্ব্বপ্রযত্নে চালু রাখ। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আস্তে আস্তে মণ্ডলীর শক্তি ও বিস্তার বৃদ্ধি পাইবে। তোমরা ধারাবাহিক কর্ম্মের অপার শক্তিতে বিশ্বাস রাখিও। অবিরাম অবিশ্রাম অক্লান্ত অধ্যবসায়ে কাজ করিয়া যাইতে থাকারই নাম যে সফল সংগঠন, এই কথাটী ভুলিয়া যাইও না।

তুমি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেছ, তাহার প্রায়গুলিই সৎলোক, সাধু, মহাপুরুষ, দেবতা, গুরুদেব বা পরমেশ্বর বিষয়ক। এই রকমের স্বপ্ন দেখা ভালই ত। এই সকল স্বপ্নের জন্য উদ্বিগ্ন বা উৎকণ্ঠিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বপ্ন সবই সত্য হয় না, স্বপ্ন সবই আবার নিরর্থকও নহে। ভগবান যতদিন তোমাকে স্বপ্ন দেখাইতেছেন, ততদিন অনাসক্ত মনে স্বপ্ন দেখিতে থাক। স্বপ্ন দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীবও হইও না, স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কিতও হইও না। প্রতিটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজিয়াও সময় নষ্ট করিও না। তোমার নিজের জাগতিক কর্ত্তব্য ও আধ্যাত্মিক কৃত্য সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট কিছু ধারণা এতগুলি দিনে হইয়াছে। সেই অনুযায়ী নিজের কর্ত্তব্য অনলস প্রযত্নে করিয়া যাইতে থাক। স্বপ্নের মনে স্বপ্ন চলুক, তোমার মনে তুমি চল। স্বপ্নে যে চুলদাড়ি দেখিয়াছ, তাহা সাপ না মহাদেবের জটা, স্বপ্নে যে নদীস্রোত দেখিয়াছ, তাহা দেশব্যাপী বন্যার পূর্ব্বাভাস না তোমার সুপ্ত সম্ভোগ-লিপ্সারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত, এই সকল গবেষণায় মত্ত হইয়া কোনও লাভ নাই। স্বপ্ন নিজের মতে চলিতে থাকুক, তুমি তোমার আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সমূহ সদ্‌গুরু-নির্দ্দিষ্ট বিধিতে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক করিয়া যাইতে থাক। স্বপ্ন মনের অবচেতন উপন্যাস, ইহার অর্থ বুঝিলে বা না বুঝিলে ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। নিজের কাজ নিজে করিয়া যাইতে পারাটাই বড় কথা, স্বপ্নকে তোমার জীবন-পথের নির্ণায়ক হইতে দিও না। কারণ, অনেক স্বপ্ন মানুষের জীবন-ব্রতের বিরুদ্ধ অবস্থারও সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তথাপি বলিব, ভাল স্বপ্ন দেখা ভাল এবং আরও বলিব যে, অত্যধিক স্বপ্ন দেখাও কাজের কথা নহে। নিদ্রা তরল হইলেও সাধারণতঃ স্বপ্নের প্রাবল্য ঘটে। প্রত্যহ স্নানের কালে নাভিমূলে পঞ্চাশ ঘটি

করিয়া জল ঢালিবে। প্রত্যহ শয়নকালে নাভিমূলে ইষ্টধ্যান করিবে, ভ্রূমধ্যে নহে। এই দুইটী নিয়ম পালন করিলেই সুনিদ্রা হইবে এবং বৃথা স্বপ্ন দেখার দায় হইতে উদ্ধার পাইবে। স্বপ্নটী ভালই বরং হইল, তবু অকারণে তাহা দেখিয়া সময় নষ্ট করায় লাভ নাই। যে সময়ে স্বপ্ন দেখিয়া মনকে নানা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিতেছ, সেই সময়ে স্বপ্নহীন নিদ্রা উপভোগের দ্বারা মনকে বিশ্রাম দিবার ফলে ভগবচ্চরণ সর্ব্বদা স্মরণ করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য তোমার বর্দ্ধিত হইলে পরিণামে ইহা অধিকতর লাভজনক হইবে। স্বপ্ন দেখাটা অনেকেরই একটা বাতিক, স্বপ্ন দেখা কাহারও কাহারও পক্ষে একটা বিলাস, একটা ব্যসন বা একটা নেশা। বিলাস, ব্যসন ও নেশা নিশ্চয়ই সর্ব্বথা সুপরিত্যাজ্য।

তুমি তোমার স্বপ্নের বিবরণ সর্ব্বত্র গাহিয়া বেড়াইও না। ইহার অনেক কুফল আছে। যত ভাল স্বপ্নই দেখ না কেন, উহা স্বপ্নই, বাস্তব ঘটনা নহে। ভাল ভাল স্বপ্নের বিবরণ কহিয়া বন্ধুসমাজে সমাদর ও সম্মান পাইবার চেষ্টা যাহারা করে, তাহারা একপ্রকারের তস্কর। এসব স্বপ্নের গালভরা গল্প শুনিয়া যাহারা অভিভূত হয়, তাহারা একপ্রকারের আত্মপ্রতারক। কত লোক কত জনের নামে কত মিথ্যা স্বপ্ন প্রচার করিয়া জুয়াচুরির কত বড় বড় ফলাও কারবার জগতে খুলিয়াছে, খোঁজ নিলে তাহার সংখ্যা গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। বাস্তবে তুমি কতটুকু সৎকার্য্য করিয়াছ, বাস্তবে তুমি কতটুকু তপস্যা করিয়াছ, বাস্তবে তুমি কতটুকু পবিত্রতার সাধনা করিয়াছ, তাহার উপরেই তোমার সম্মানার্হতা নির্ভর করিবে। বোলচাল দিয়া বা চালাকী করিয়া তুমি লোক-সম্মান কুড়াইতেছ, তোমার উপরে তোমার সতীর্থদের এই সন্দেহ

একবার হইলে তাহারা জীবনে আর তোমাকে কখনো বিশ্বাস করিবে না।

ভাল স্বপ্নের চেয়েও বড় একটী জিনিষ কিন্তু রহিয়াছে। তাহার নাম ভাল অনুভূতি। অবিরাম পরমেশ্বরের নাম জপিতে জপিতে অন্তরে অনেক অনির্ব্বচনীয় অপ্রত্যাশিত অত্যদ্‌ভুত অনুভূতি-সমূহ জাগে, যাহা দার্শনিক বিচারে অনবদ্য, কবিত্বের হিসাবে অতুলনীয়। এই সকল অনুভূতি লাভের জন্য নিদ্রা বা স্বপ্নের প্রয়োজন হয় না। এ সকল অনুভূতি জাগ্রদবস্থাতেই লব্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে তোমার স্মৃতি এবং প্রজ্ঞা অনুভূতির সরসতায় নিয়ত সজীব থাকে, তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চল। কাল্পনিক স্বপ্ন-বিলাসের পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়ান, কাজের লোকের পক্ষে নিরর্থক।

দেশই বল, আর জগৎই বল, বর্ত্তমানে যে মানুষগুলিকে তাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের হইতে হইবে উচ্চতম অনুভূতি-সম্পন্ন বাস্তব জগতের কাজের মানুষ। স্বপ্নের ফানুস উড়াইয়া জীবনটাকে কল্পনাকুহকে অপচয়িত করিয়া দিবার কোনো মানে হয় না। চেষ্টা কর, স্বপ্ন যাহাতে কম দেখিতে হয়। নিদ্রার স্বপ্ন ত অলস স্বপ্ন। জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে চেষ্টা কর। সেই স্বপ্ন আদর্শবাদের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বিশ্ববাসী সকলের কুশলের জন্য আত্মোৎসর্গের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিজ স্বার্থবোধকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়া নিষ্কাম নিষ্কলুষ এক মহনীয় অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করার স্বপ্ন।

যে ট্রেণটীতে শিলিগুড়ি যাইবার জন্য চাপিব, তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই নিউ মাল ষ্টেশনে আসিয়া পড়িতেছে। এই জন্য এইখানেই পত্র সমাপ্ত করিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
২৬ ফাল্গুন, শনিবার ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১৯শে ফাল্গুন তারিখের পত্র পাইলাম। খবরের কাগজে যে সকল কথা পড়ি, অনেক সময়ে তোমাদের ব্যক্তিগত পত্রগুলিতে তার বিপরীত কথা থাকে। ফলে, জানিতে কৌতূহল জন্মে যে, সরকারী সূত্রে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিগুলি সত্য না তোমাদের কথাগুলি সত্য। সত্য যাহাই হউক, আর মিথ্যা যাহাই হউক, ইহা যথার্থ যে তোমরা এক মহাসঙ্কটে পড়িয়াছ। ভারত-ব্যবচ্ছেদের পরে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পরে বাধ্য হইয়া তোমরা যে দেশে আসিয়া মাথা গুঁজিয়া দিনাতিপাত করিতে চেষ্টা করিতেছিলে, সেই দেশে তোমরা হাজার বিপদ-সম্ভাবনার মধ্যেও থাকিয়া যাইবারই চেষ্টা করিবে, নাকি, অন্যত্র পাততাড়ি গুটাইয়া নিবে, এই দুশ্চিন্তা তোমাদিগকে আকুল করিয়াছে। অথচ অন্যত্র যাইবার বা থাকিবার তোমাদের সামর্থ্যও নাই।

সিলেট-রেফারেণ্ডামের প্রাক্কালে প্রায় সমগ্র আসাম আমি ঘুরিয়াছিলাম। বিজ্ঞ বিজ্ঞ স্থানীয় নেতাদের একত্র করিয়া বলিয়াছিলাম, শ্রীহট্টকে পাকিস্তানে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিবেন না, কেননা, তাহাতে দুইটী বিপদ সুনিশ্চিত। একটী বিপদ, পাকিস্তানের কামান ডাউকির কাছে আসিয়া গর্জ্জন করিবে। অপরটী এই যে, শ্রীহট্ট এবং সন্নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালী হিন্দুরা নিকটতম প্রদেশ আসামে আসিয়া ভিড় জমাইতে বাধ্য হইবে। নেতৃস্থানীয়রা এযুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেন

নাই। এই ভুলটার তুল্য আর একটা ভুল স্বপ্নবিলাসী দিল্লীশ্বরেরাও করিয়াছিলেন। বৃটিশ রাজত্বকালে ভারতের সহিত তিব্বতের যে সম্পর্ক ছিল, তাহার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অনগ্রসর তিব্বতবাসীদিগকে আধুনিকতার যুগে প্রবেশ করিবার কাজে ভারতরাষ্ট্র অনায়াসে অনেক সহায়তা করিতে পারিতেন, সদ্যঃস্বাধীন বাংলাদেশ নামে পরিচিত পূর্ব্ববঙ্গ রাষ্ট্রকে যে সহায়তাগুলি ভারত সরকার প্রসারিত-হস্তে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে অজস্র ভাবে দান করিয়া পৃথিবীর প্রশংসা কুড়াইতেছেন। মানব-দরদের এই সুমহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইবার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ভারতের অন্ধ নেতারা তিব্বতকে ঠেলিয়া চীনের কবলে ফেলিয়া দিলেন। ফলে আজ আসামের মতন অরক্ষিত ও বিপদাশঙ্কাপূর্ণ প্রদেশ ভারতের কুত্রাপি নাই। পরমাণু-শক্তিতে শক্তিমান চীন আসাম কাড়িয়া নিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিলে আসামী-বাঙ্গালী-নির্ব্বিশেষে সকলকে শেষ আশ্রয় গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে প্রবেশ করিতে হইবে এবং ভিক্ষান্নে দিন কাটাইতে হইবে, সামরিক ব্যাপারের জ্ঞান-সম্পন্ন যে-কোনও স্কুলের ছেলেও এই ব্যাপারটা অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহা আমাদের দেশের জ্ঞানী, গুণী, বহুজনপূজিত, জগৎ-রত্ন নেতারা বুঝিতে পারেন নাই। আমি মূর্খ, একথা বলিয়া আফশোষ করিলেই ইতিহাস কাহাকেও ক্ষমা করে না, মূর্খতার মূল্য প্রত্যেককে উপযুক্ত সময়ে দিতে হয়। সুতরাং ভবিষ্যতের বিপদের দিনের কথা স্মরণ করিয়া তোমাদের উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া চলিতে হইবে। ঠেঙ্গাড়ে চীনারা আসামের সবুজ সুন্দর কোমল মাটিতে আসিয়া নামিলে, মুখ চিনিয়া কাহাকেও কোলে তুলিবে, কাহাকেও বুটের তলায় পিষিবে, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। বাঙ্গালী-অসমিয়া-নির্ব্বিশেষে সকলকে ইহারা

সমান ভাবে দলন করিবে এবং এই দলন যত বীভৎস, যত কুৎসিত, যত পাশবিক হইবে, উহাদের তাহাতে তত অধিক উল্লাসের আস্বাদন ঘটিবে। সেই দুর্দিনের দিকে তাকাইয়া আজ প্রতি জনে সন্তর্পণে পদক্ষেপ কর। মাথা গুঁজিবার কণামাত্র ঠাঁই ভূভারতে অন্যত্র থাকিলে তোমরা যে তোমাদের ভস্মীভূত গৃহগুলির ছাইগুলি কুড়াইয়া নিয়া আসামেরই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অন্য এক স্থানে যাইয়া খড়কুটা দিয়া ঘর বাঁধিবার দ্বিতীয় চেষ্টা করিতে না, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। উপায় যখন নাই, তখন ওখানেই তোমাদের থাকিতে হইবে। থাকিতে হইবে ঈশ্বর-বিশ্বাস লইয়া। থাকিতে হইবে সাহসী মন লইয়া। থাকিতে হইবে বিদ্বেষ-বুদ্ধিহীন নির্ম্মল প্রজ্ঞা লইয়া। থাকিতে হইবে পুনঃ পুনঃ বিপদ আসিবে এবং চলিয়া যাইবে এবং সমুদ্র-তরঙ্গ-তুল্য অসংখ্য উৎপাতের পরেও তোমরা বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিবে, এই পণ লইয়া। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত সব-কিছুকে অগ্রাহ্য করিয়া তোমাদের থাকিতে হইবে। থাকা ছাড়া অন্য উপায় যাহার নাই, সে মরিলেও থাকিবে, বাঁচিলেও থাকিবে। থাকিতে তোমাদের হইবেই, তাহার জন্য যতগুলি প্রাণই বিসর্জ্জন করিতে হউক না কেন। চৈনিক আক্রমণের ব্যাপক বিপদের দিনে সবাই সোজা দিল্লী ছুটিয়া যাইও, অন্ধ রাষ্ট্রকর্ণধারদের জিজ্ঞাসা করিতে যে, তখন তোমরা কোথায় যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে আসিও না। এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্তু-জানোয়ারেরাই সিং উচাইয়া নেতৃত্ব করিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
২৭ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭৯
(১১-৩-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের মা—ও বাবা—, তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের কার্ডখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

পিতামাতার সদ্‌গুণ পুত্রকন্যাতে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় তখন, যখন পুত্রকন্যা পিতামাতার প্রতি থাকে শ্রদ্ধান্বিত। গুরুর সদ্‌গুণ শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় তখন, যখন শিষ্যের গুরুশ্রদ্ধা হয় নিখাদ স্বর্ণ ও বিশুদ্ধ। প্রকৃত গুরু কখনো শিষ্যকে ডাকিয়া বলেন না—"আমাকে ভক্তি কর্, আমাকে শ্রদ্ধা কর্।" তিনি নিজ জীবনে দৈবী সম্পদকে সাত্ত্বিক শুদ্ধতায় বিকশিত করিয়া তুলিবার তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, শিষ্য নিজের অন্তরের সদ্‌গুণ প্রভাবে গুরুতে আস্থাবান্, শ্রদ্ধাবান্, ভক্তিমান্, নিষ্ঠাবান্ হয়। শিষ্য যে গুরুকে ভক্তি করে, ভালবাসে, তাহা শিষ্যেরই অন্তরের সদ্‌গুণ-রাশির ফলে, ইহার মধ্যে গুরুর কৃতিত্ব কিছু নাই। গুরু যে নিজের জীবন-কর্ম্মে ও সাধন-ধর্ম্মে কদাচ স্খলিতাদর্শ হইতেছেন না, গুরুর গুরুত্ব সংরক্ষিত হইতেছে এই খানে।

তোমরা ভক্তিমান্ হও, সাধনশীল হও, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ করি।

স্বামী ও স্ত্রীর জীবন বড় সুন্দর জীবন। কারণ, ইহারা একে অন্যকে প্রতি পদে সর্ব্ব ভাবে সহায়তা করিয়া চলে বা চলিতে পারে। কিন্তু

এ জীবন মোহেরও জীবন। মোহময়ী কুহেলিকা ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞাননেত্র ঢাকিয়া ফেলিতে চাহে, ইহাও সত্য। কিন্তু লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তবে হঠাৎ কখনো পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে একজন আর একজনকে হাতে ধরিয়া টানিয়াও ত তুলিতে পারে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে মৈত্রী-ভাবনা ও প্রেম-প্রীতি যদি প্রগাঢ় থাকে, তবে কোনও পতনই তোমাদের পক্ষে স্থায়ী নহে। ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিলে যেমন তাহা নিয়া দুশ্চিন্তা করিয়া কাল কাটাইতে নাই, স্বামী ও স্ত্রীর জীবনে কখনো ক্ষণিকের যতিভঙ্গ ঘটিলে তাহা নিয়া উদ্বেগ করিতে নাই, হা-হুতাশ করিতে নাই, দিবারাত্রি অনুতাপের অশ্রুতে বুক ভাসাইতে নাই। দৃঢ় পণ করিতে হয় যে, যে ভুল হঠাৎ করিয়া ফেলিলে, তাহা যেন আর না কর।

দুঃখকষ্ট সংসারে থাকিবেই। ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদের চলিবার পথ। পরিণামে জয়ী হইবে, এই বিশ্বাস রাখিও। অফুরন্ত প্রেমে ভর রাখিয়া চল, দুর্গম পথও সুগম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

২৮ ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৭৯

(১২-৩-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকে দেশ ও জগতের কল্যাণসাধক যত প্রয়াস, প্রচেষ্টা, আন্দোলন ও আয়োজন বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন পথাবলম্বী কর্ম্মী মানুষেরা করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের কাজের অবিরোধী ভাবে তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাও। একটা ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাইতে থাক। ক্ষীণ হইলেও কাজের স্রোত যেন চির-অব্যাহত থাকে। প্রতি জনে প্রত্যহ কিছু না কিছু কাজ করিয়া তবে আত্মপ্রসাদ আস্বাদন করিও, কোনও কাজ না করিয়া নহে, শুধু কথা বলিয়া যাওয়া বা অপরকে দামী দামী উপদেশ দেওয়াকে কাজ বলিয়া ভ্রম করিও না। কথা সকল সময়েই কাজের সহায়িকা হয় না, অধিকাংশ সময়েই হয় কাজের বাধিকা বা ঘাতিকা। কথা কমাইয়া কাজকে বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। কথার বীরেরা অনেক সাহিত্য রচনা করিয়া যায় এই প্রত্যাশায় যে অপরেরা আসিয়া তাহাদের জল্পনাকে কর্ম্মে রূপদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে। আমি জীবন ভরিয়া শুধু কথা কহিব আর তোমরা কাজ করিয়া ধন্য হইবে, এইরূপ আশা এক প্রকারের দুরাশা মাত্র। ভাগ্যবান্ কোনও কোনও কথক জীবনে এমন কথা বলিয়া যান, যাহার কিছু কিছু অংশ মানুষের জীবনে বা সমাজের ইতিহাসে রূপায়িত হয়। প্রত্যেক কথকই যদি নিজেকে তেমন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া গণনা করিয়া কেবল কথায় মজগুল হইতে চাহে, তাহা হইলে দুনিয়া-জোড়া বক্‌বকানি শোনার বিড়ম্বনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। কথা কমাও, কাজ বাড়াও। অকারণ, অনর্থক, অপরিকল্পিত, অবান্তর কাজ ছাড়িয়া দিয়া ঠিক প্রয়োজনের মাপকাটি অনুযায়ী কাজগুলি নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাও। সকলে মিলিয়া ব্যাপক কোনও পরিকল্পনা রচনা করিয়া যদি

কখনো একটী স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে পার, তাহা হইলে জনে জনে সেই পরিকল্পনার এক এক টুকরা ভগ্নাংশ নিয়া নিখুঁত ভাবে কাজ করিয়া গেলে দেখা যাইবে যে, বিড়লাদের হিন্দ্-মোটর-কারখানাটা সমগ্র দেশের প্রতি ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতি স্থানে প্রতি জনে পরিকল্পনানুযায়ী যে অল্প অল্প কাজ নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতেছে, তাহার ফলে হঠাৎ যে-কোনও আমগাছের, জামগাছের, কাঁঠালগাছে নীরব নিভৃত ছায়াতলে এক একটা করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মোটর গাড়ী তৈরী হইয়া দূরপথগামী যাত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছে। হচ্-পচ্ করিয়া কতকগুলি কাজ করিয়া হুড়াহুড়ি সৃষ্টি করিতে পারিলেই হইল না, প্রকৃত কাজের গতি কম না হইলেও প্রকৃতি শান্ত ও সুস্থির।

একটী প্রাণীকেও কর্ম্মী হইবার অযোগ্য বলিয়া মনে করিও না। তবে, মদ্যপায়ী, পরনারীতে আসক্ত, জুয়াতে অনুরক্ত, বহুভাষী এবং চৌরচরিত্র লোককে কর্ম্মী রূপে পাইবার দুরন্ত শখটী করিও না। নারী-কর্ম্মী সম্পর্কেও উক্তরূপ কথাগুলি স্মরণে রাখিতে হইবে। মানুষ মাত্রকেই সৎকর্ম্মী রূপে পাইবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কলঙ্কিত-স্বভাবের লোকদের দিয়া দেবপূজার আয়োজন দুঃসাহসিক কাজ। কোনও কর্ম্মীকে অবহেলা করিবে না, সকলের সকল শক্তিকেই কাজে লাগাইবে কিন্তু তাহার ভিতরে পরিপূর্ণ আদর্শবাদ ও সততা যে আসিয়াছে, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। তোমার আচরণে ঔদ্ধত্য বা অত্যাভিজাত্য বশতঃ যদি কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তবে আঘাত হানিয়া তাহার ক্ষোভ নিবারণের চেষ্টা সফল হইবে না, সকল অভিমান ও ভ্রান্ত ধারণাকে স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা দূর করিয়া দিতে হইবে।

নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সখ্য থাকিলে কাজে জোর বাঁধিবে, তুচ্ছ কাজও মহৎ সাফল্যে মণ্ডিত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)

২৮ ফাল্গুন, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অতীতে কি ভুল করিয়াছ, তাহা নিয়া আর দুশ্চিন্তা করিও না। বর্ত্তমান শক্তি-সামর্থ্যের কি করিয়া চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করিতে পার, তাহার ফিকিরে থাক। সুযোগ পাইলে, তাহা যতই তুচ্ছ হউক, তাহাকে হেলায় হারাইবে না, এই পণ করিয়া পাঁয়তারায় থাক। সর্ব্বদা যে-কোনও অবস্থায় দুরন্ত কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত থাক। তোমাকে অপ্রস্তুত দেখিয়া তোমার প্রাপ্য সুযোগ অপর একজনের নিকটে চলিয়া যাইবে, ইহা যেন কদাচ না হয়।

সহকর্ম্মীদিগকে সর্ব্বদার তরে চাঙ্গা রাখ। একই কথা বারংবার বলিয়া বলিয়া প্রত্যেকের মনে প্রবল প্রত্যয়, সুদৃঢ় সঙ্কল্প এবং অটল অধ্যবসায় জাগ্রত কর। অসাধ্য বলিয়া জগতে যে কোনও কিছু নাই, এই বিশ্বাসে প্রতিজনকে উদ্দীপিত কর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের সহযোগে

যে বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা কেবল কল্পনার বিলাস বলিয়া মনে করিও না, সত্য বলিয়া স্বীকার কর এবং সে স্বীকৃতির কার্য্যকর সমর্থনে প্রতি জনে বাস্তব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লাগিয়া যাও। অন্যেরা যাহা দশ যুগে করিতে পারে নাই, তাহা তোমরা এক দিনে করিবে। অন্যেরা যাহা ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ডের মধ্যে করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা তোমরা বিশাল ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া প্রায় সর্ব্বত্র করিতে সমর্থ হইবে। আত্মবিশ্বাসের তুল্য বল নাই, ভগবন্নির্ভরের তুল্য ভরসা নাই। তোমাদের প্রকৃত বল-ভরসার মূলাধারটীকে চিনিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

Hari Om

Gurudham
26-3-73

Dear C—,

My blessings.

You desire to live as I do. This is granted for you. Don't despair. Think yourself in ME, and ME in you, I will do the rest. * * * Rest assured, I am always with you,

Affly yours
Swarupananda

বঙ্গানুবাদ

হরিওঁ

গুরুধাম

১৬-৩-৭৩ ইং

স্নেহের—,

আমার আশীর্ব্বাদ।

তুমি আমার মতন জীবন যাপন করিতে চাহ। এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। হতাশ হইও না। নিজেকে আমার মধ্যে দেখ, তোমার মধ্যে আমাকে দেখ। বাকী কাজ আমি করিব। * * * নিশ্চিন্ত থাক যে, আমি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছি। ইতি—

স্নেহানুরক্ত

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ চৈত্র, সোমবার, ১৩৭৯

(২৬-৩-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ এবং আশিস নিও। * * * তোমার পত্নী ও কন্যার পত্র আমি দুই দিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। তোমার কন্যার সুন্দর হস্তাক্ষর দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কেহ কেহ মানুষের সুন্দর চেহারা দেখিলে খুশী হয়, আমি সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিলে খুশী হই। অতিলেখনের দোষে যদিও আমি আমার হস্তাক্ষরের

সুন্দরতা বজায় রাখিতে পারি নাই, তথাপি প্রত্যহ আমাকে শতাধিক লোকের হস্তাক্ষর পাঠ করিতে হয় বলিয়া সুন্দর হস্তাক্ষরের আদর আমার কাছে অবশ্যম্ভাবী। আমি ত চাহি যে, পৃথিবীর সকল লোকের হস্তাক্ষর সুন্দর হউক আর হউক তাহাদের মন, মেজাজ, রুচি ও বুদ্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। রক্তমাংসের ঢেলা শরীরটা সুন্দর হইল কি না হইল, তাহাতে কিছু যায় আসে না, যদি দেহটা থাকে সুস্থ, সুপটু ও কর্ম্মক্ষম আর তাহা যদি নিয়োজিত থাকে সৎকর্ম্মে।

পূর্ব্ববঙ্গের উপরে আপতিত পাকিস্তানী হানাদারেরা তোমাকে জেলে নিয়া পুরিয়াছিল আর তিনমাস জেলে ধরিয়া রাখিবার পরে ছাড়িয়াও দিয়াছিল, এই সংবাদে যুগপৎ ব্যথিত ও আনন্দিত হইলাম। সুধীর, অবনী, নিরঞ্জন আদিকে তাহারা ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল কিন্তু আর ছাড়িয়া দেয় নাই। তোমার উপরে ঈশ্বর-করুণা সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল, নতুবা বুকের উপরে কয়েকবার বন্দুক উচাইয়া ধরিয়া সরাইয়া নেওয়া ঐ বর্ব্বরদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তুমি যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলে, তাহা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু উৎফুল্ল হইয়াছি এই সংবাদে যে, একদা তোমাদের তরুণ কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় সদাচার, সন্নীতি, পবিত্রতা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে যে সকল উপদেশ আমার নিকটে পাইয়া নিজ জীবনকে গঠন করিয়াছিলে, সেই আদর্শ নিখুঁত ভাবে বর্ত্তমান ছাত্র-সমাজের মধ্যে প্রচারে তুমি যত্নবান্ রহিয়াছ। অকারণে বীর্য্যক্ষয় করিবে না, অবৈধ বীর্য্যক্ষয় করিবে না, স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব অর্পণ ও পোষণ করিবে, জগতের যে-কোনও জাতির নারীর অসম্মানকে নিজের মায়ের অসম্মান বলিয়া জ্ঞান করিবে, মানুষ মাত্রকেই সততা ও শুচিতার দিকে আকর্ষণ করিবে, মানুষে মানুষে

মৈত্রীভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মানুষকে ভ্রাতৃভাব দিয়া আপন করিবে,—এই সকল উপদেশ পৃথিবীর সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট অনুভব বা বোধোদয় জাগ্রত করিবার সাধনা মানব-সভ্যতাকে উন্নতি-দানচেষ্টার এক অপরিহার্য্য অংশ-বিশেষ। যে কাজ একদা তোমাদের তরুণ কৈশোরে আমি তোমাদের মধ্যে অকুতোভয়ে সুরু করিয়াছিলাম, সেই কাজ তোমরা আবার নূতন তরুণ ও নূতন কিশোরদের মধ্যে সুরু করিয়া দিয়াছ জানিলে কেন আমায় আনন্দের উদ্রেক হইবে না? দিকে দিকে তোমরা একাজ আরম্ভ করিয়া দাও, দলে দলে তোমরা এ কাজে আত্মনিয়োগ কর।

তোমাদের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সৎকার্য্য বা সৎ চেষ্টাগুলিকে যাহাতে কেহ বৃথা সন্দেহের অপদৃষ্টিতে দেখিতে না পারে, তাহার জন্য তোমরা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ্য কর্ম্মনীতি নিয়া কাজ করিও। গোপনতার পথে সৎকার্য্য করিতে গেলেও তৎসম্পর্কে সব-কিছু জানিতে পারার অক্ষমতা হেতু একদল এক-চক্ষু ব্যক্তিরা উহাতে নানা অন্যায় অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জঞ্জাল ছড়াইতে পারে। সেই আশঙ্কার মূলোৎপাটন করিয়া চলিবার জন্য তোমরা সচেষ্ট থাকিও। তোমাদের প্রতিটি সৎ প্রয়াস জগন্মঙ্গল-লক্ষ্যে পরিচালিত হউক এবং জগতের শত শত স্বার্থপর মানুষকে জগৎকল্যাণে প্রেরণা প্রদান করুক। কেবল নিজের স্বার্থ না চাহিয়া জগতের প্রতিটী মানুষ যদি জগদ্বাসী সকলের কুশলের দিকে তাকাইয়া পথ চলিত, তাহা হইলে কত অন্ধ যে দিব্য দৃষ্টি ফিরিয়া পাইত কত পঙ্গু যে গিরিলঙ্ঘন করিতে পারিত, কত মূক ও বধির যে বাক্‌শক্তি

লাভ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমার গুণানুকীর্তন করিত, ভাবিতে প্রাণে সুখের শিহরণ জাগিয়া ওঠে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

গুরুধাম
কাঁকুরগাছি, কলিকাতা-৫৪
১২ চৈত্র, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, * * * তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটী কথা বলিয়া রাখি যে, এক মায়ের পেটের ভাইদের সম্বন্ধ যেমন প্রগাঢ় প্রীতির ও সহানুভূতির হওয়া সঙ্গত, এক গুরুভাইদের সহিত অপর গুরুভাইয়ের সম্বন্ধ তদ্রূপ হওয়া উচিত। আবার নিজের গুরুভাই সম্পর্কে তোমার মনে যতখানি শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনুরাগ ও মমত্ব-বোধ থাকিবে, স্বদেশের প্রতিটি মানব সম্পর্কে তোমাদের তাহাই হওয়া উচিত। আবার যেহেতু তোমরা এক অখণ্ড-মতবাদাদর্শে জীবন গঠন করিয়া আসিতেছ, সেই হেতুতে বিশ্বের প্রতিটি মানব-সম্পর্কে ঠিক সেই মনোভাবেরই সম্প্রসারণ তোমাদের মধ্যে দেখিতে আমি অভিলাষী। অবশ্য, জাগতিক পরিস্থিতি অনেক সময়ে এমন জটিল হয় যে, উপরে বর্ণিত উচ্চ আদর্শ মনে মনে পোষণ করিলেও পারিবারিক কর্ত্তব্য, সামাজিক কর্ত্তব্য, দৈহিক কর্ত্তব্য এই মহৎ আদর্শবাদকে পূর্ণতঃ

অনুসরণ করিতে দেয় না। ইহা আমাদের আবিষ্কৃত সভ্যতার অসম্পূর্ণতা, আদর্শবাদী মানুষটীর ইহাতে কোনও দোষ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৭ বৈশাখ, সোমবার, ১৩৮০
(৩০-৪-৭৩ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নারী এক মহাশক্তি, তাহার সহায়তা পাইলে জগতে পুরুষ দুর্জ্জয়, তাহার বিরুদ্ধতা পাইলে পুরুষ পঙ্গুপ্রায়,—এই একটী প্রত্যয়ে আমার চিন্তাধারা সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমি বিবাহিত দম্পতীদের দিকে বড়ই আশারুণ নেত্রে তাকাইয়া থাকি। আমার এই শুভ প্রত্যাশা অনেকের গার্হস্থ্য জীবনে সফল হইয়াছে দেখিয়া আমার এই বিষয়ে বিশ্বাস আরও বাড়িয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমরা দুজনে—স্বামী ও স্ত্রী—সম্মিলিত ভাবে এমন কিছু কাজ জীবন ভরিয়া করিয়া যাও, যেন জগতে তোমাদের পদাঙ্ক স্পষ্ট ভাবে থাকিয়া যায় এবং পরবর্ত্তীরা তাহা দেখিয়া দেখিয়া নিজেদের পথ চলিতে আগ্রহ, আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করে। তোমাদের দুজনের মধ্যে অনাবিল প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইহা সম্ভব হইবে এবং আমি তোমাদিগকে তদ্রূপ আশীর্ব্বাদই করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

গুরুধাম

১৭ বৈশাখ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উত্থান থাকিলেই পতন আছে, পতন থাকিলেই উত্থান আছে। উত্থানের সময়ে অহঙ্কারে গদ্‌গদ হইতে নাই, বরং সাবধান থাকিতে হয় যে, পতন যেন না আসে। পতন আসিলেই হতাশ হইতে নাই, বরং চেষ্টা করিতে হয়, যেন উত্থান লাভ অবিলম্বে ঘটে। উত্থানে কি পতনে, নিদ্রার কি জাগরণে, কর্ম্মে কি বিশ্রামে গতি—অবিরাম গতি—অব্যাহত রাখিতে হইবে। শরীর যখন ঊর্দ্ধ-গমনে সমর্থ নয়, তখনো মনে মনে ঊর্দ্ধ গমনের কল্পনাকে সজাগ রাখিতে হয়। জীবনকে সার্থক করিবার ইহাই পন্থা,—হতাশ হইও না। অন্তরের প্রেমকে জাগ্রত কর, প্রেম পতনকে পরাহত করিবে। প্রকৃত প্রেম অন্তরে নাই বলিয়াই ত প্রাকৃত দুর্ব্বলতাকে প্রেম বলিয়া ভ্রম করিয়া থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি

৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮০

(১৯ মে, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ডমণ্ডলীর স্থাপন ও পরিচালনকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা পরস্পরে নিত্য নূতন কলহের সূচনা করিতে থাকিলে তোমাদের দ্বারা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতি, নৈতিক অনুশীলন এবং সামূহিক সৎকর্ম্ম সমূহের সুসম্পাদন কি করিয়া হইবে ? নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ লইয়াই ত' বল, বাক্য ও প্রতিভার চূড়ান্ত অপচয় হইয়া যাইবে। সুতরাং কলহ দেখিলে দূরে সরিয়া যাইও, লিপ্ত হইও না।

পাশাপাশি বা কাছাকাছি স্থানে দুইটী মণ্ডলী থাকিলে এক মণ্ডলীর সভ্য অন্য মণ্ডলীতে গিয়া উপাসনায় যোগ দিতে পারিবে না, এমন আজগুবি কথা তোমাদিগকে কে শুনাইল ? নিজ বাসস্থানের অতি নিকটবর্ত্তী মণ্ডলীর প্রতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াও একজন কিছু দূরবর্ত্তী অন্য এক মণ্ডলীর অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব প্রগাঢ় হইবার সম্ভাবনা জন্মে। মণ্ডলীর প্রধান কাজ ত হইল সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীতে অত্যধিক সংখ্যায় উপাসক-উপাসিকার সময় মত যোগদানের চেষ্টায় উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করা।

মণ্ডলীর সম্পাদককে অভিমান-বর্জ্জিত হইতে হইবে। নতুবা মানুষের মন তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নাও হইতে পারে। শ্রদ্ধা পাইবার অযোগ্য ব্যক্তি সম্পাদক হইলে মণ্ডলী আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া যায়। দাম্ভিক, অপরের সম্মানের প্রতি অমনোযোগী, জেদী ও রাগী লোকের সম্পাদকীয় দাপট কে কতদিন সহ্য করিবে, বল ? যেখানে মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ণীত নাই, সে স্থলে এই উপাসনাটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা জনের গৃহে হইবে এবং স্থান, তারিখ ও সময়টী চারিদিকের সকলকে জানাইয়া দিবার দায়িত্ব মণ্ডলী-সম্পাদকের

নিজস্ব। এই দায়িত্বকে যে অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিবে, সে যত বড় জ্ঞানী, গুণী, ধনী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিই হইয়া থাকুক না কেন, তাহার সম্পাদকত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

মণ্ডলীর সৃষ্টি তখনই সার্থক এবং মণ্ডলীর পুষ্টি তখনই সম্ভব, যখন মণ্ডলীভুক্ত উপাসক ও উপাসিকাদের বারংবার পারস্পরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সমবেত উপাসনাগুলির ফলে প্রত্যেকেরই মনে সন্তোষ, সাত্ত্বিক ভাব, ক্ষমাশীলতা, ঐক্য-বোধ, ভালবাসা ও মমত্ব জাগরিত হয়। মণ্ডলী-গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে তাকাইয়া প্রতি জনে চলিলে এক একটা মণ্ডলী সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে এবং তাহাই আমাদের প্রতিজনের কামনা জানিও। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি
৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত তোমার পত্রখানা পড়িতে বেশ কষ্ট হইয়াছে, তথাপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। যে আগ্রহ নিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে আদর্শের সেবা করিতেছিলে, তাহা নিয়া ভারতেও কাজ সুরু করিয়াছ দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছি।

তোমাদের সমবেত উপাসনায় তোমরা গীতা পড় না, চণ্ডী পড় না, চৈতন্য-চরিতামৃত পড় না বা রামকৃষ্ণ-কথামৃত পড় না। পড় শুধু "অখণ্ড-সংহিতা"। এই জন্য লোকে তোমাদিগকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক বলিয়া আখ্যা দিতেছে। এই গালি শুনিয়া চঞ্চল হইয়া নিজেদের পন্থা বা প্রকরণ পরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন নাই। তোমাদের সমবেত উপাসনা ও তজ্জাতীয় অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে তোমরা উপক্রমস্বরূপে অখণ্ড-সংহিতাই পাঠ করিবে। ইহার ফলে কেহ তোমাদিগকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া আখ্যা দিলে মনে কষ্ট পাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কেহ কিছু বলিলেই চটিয়া যাইতে হইবে, এটা ভাল কথা নহে। যিনি যে বিষয় যেমন বোঝেন, তাঁহাকে সে বিষয় তেমন বুঝিতে, ভাবিতে ও বলিতে দাও। এসবের প্রতিবাদ অর্থহীন। তোমরা ত তাঁহাদের কোনও অনুষ্ঠানে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ সরাইয়া দিয়া তোমাদের নিজেদের গ্রন্থ "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠ করিতে কাহাকেও বাধ্য কর না! তাহা হইলেই হইল। তোমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানে বাহিরের লোক আসিয়া নূতন নূতন শাস্ত্র পাঠ প্রচলন করিবেন, আর অসাম্প্রদায়িকতার ভেরী বাজাইবার প্রয়োজনে চুপ করিয়া তোমরা তাহাতে সায় দিয়া বসিবে, ইহা কাজের কথা নহে। আসল কথা এই যে, মনে প্রাণে তোমরা অসাম্প্রদায়িক থাক, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যার ভাব তোমরা কদাচ পোষণ করিও না এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের দ্বেষ বা ঈর্ষ্যা নাই বলিয়াই তোমরা সাগ্রহে বাঞ্ছা করিতে অধিকারী যে তোমাদের সমবেত উপাসনায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভক্তিমান্ ও সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের শুভ-সমাগম হউক। লোকের কাছে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট

পাইবার প্রয়োজনেই কি তোমরা সমবেত উপাসনা কর? তোমাদের মনে অসাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও উদারতা আছে বলিয়াই যে-কোনও সম্প্রদায়ের লোককে তোমাদের সমবেত উপাসনাতে প্রত্যাশা কর। ঘোড়া আগে না গাড়ী আগে ? কোন্‌টা আগে, তাহা বুঝিয়া লও। যেটা আগে, তাকে আগে কব্জায় আন। অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি তোমার পদ্ধতি হইতে যতই পৃথক্ হউক, সেই সম্প্রদায়ের লোকদের তোমাদের সমবেত উপাসনাতে পাইবার পথে তোমাদের মনের দিক দিয়া কোনো বাধা নাই। মুচি-মেথরই হউক, গো-শূকর-ভোজীই হউক, যে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত একাসনে কখনো তোমরা বস না, তেমন লোকই হউক, আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনাপরায়ণ মন ও শুদ্ধ শুচি দেহে আসিলে তাকেও আদর করিয়া দক্ষিণে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে কোথাও না কোথাও একটী সমাদৃত আসন তোমরা দিবে, মনের গঠনের দিক দিয়া তোমাদের স্বরূপ ইহা। সুতরাং অমুক গ্রন্থ, তমুক তন্ত্র, উশুক পুরাণ আর তুশুক শাস্ত্র তোমরা সমবেত উপাসনার প্রারম্ভিক রূপে পড়িবে না বলিয়া কেহ তোমাদের সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালি দিলে, দিক্ না! উহার প্রতি কর্ণপাত কেন করিবে ? হাজার তাগিদে পড়িলেও কোনও ভদ্রলোক কখনো নিজের বাপের নামটা বদল করিয়া বলে না। সমবেত উপাসনার পূর্ব্বক্ষণে তোমরা অখণ্ড-সংহিতাই পড়িবে। অখণ্ড-সংহিতা কোনও শাস্ত্রের মর্য্যাদা না পাইলে না পাইতে পারে, কিন্তু ইহা তোমাদের পিতৃবাণী। তোমরা যদি আমারই সন্তান হইয়া থাক, তবে ইহার চেয়ে বড় শাস্ত্র তোমাদের জন্য আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। তবে, তালে বেতালে পাঠ না করিয়া সুনির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ পাঠ করিলে ভাল। কারণ, স্বাধ্যায়ের সুফল শুধু ধর্ম্মীয়ই নহে, শিক্ষাগতও ত বটে!

নিজের ঘরে বসিয়া নিভৃত একক উপাসনায় কে কোথায় কি করে, তাহা নিয়া সি-আই-ডি-গিরির প্রয়োজন আছে কিনা, আমি বুঝি না। কিন্তু জনসাধারণকে নিয়া যে সমবেত উপাসনা, তাহাতে আমি ত আমাকে পূজা করিবার কোনও অবকাশ রাখি নাই। নিজেই আমি নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সরাইয়া রাখিয়া দিয়াছি। তাহার পরেও যে এই বিষয় নিয়া তোমরা আবার প্রশ্ন তোল এবং অন্যকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দাও, তাহার ভিতরে আমি তোমাদের প্রচ্ছন্ন একটী দ্রোহকে দেখিতে পাইতেছি। অন্তরের অপরিসীম উদারতা বশতঃ যে গুরু তোমাদিগকে দ্রোহ করিবারও বৈধ অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তোমরা এমন প্রশ্ন নিয়া আসিবে কেন, যাহার উত্তর দিতে তিনি স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করিবেন?

কলিকাতা মাণিকতলা ছায়া সিনেমার বাড়ীতে প্রায় চৌদ্দ বৎসর ভাড়াটে ছিলাম। যে ঘরে বিগ্রহ ছিলেন, সে ঘরেই সমবেত উপাসনা হইত। পাশের ঘরে আমি বাস করিতাম! সমবেত উপাসনার দিন উপাসনা হইয়া যাইবার পরে অনেকে আমার ঘরে আসিয়া আমাকেও প্রণাম করিয়া যাইত। ইহা কোনও অনাদর্শ ব্যাপার নহে। শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী বহিখানাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, উপাসনার পরে গুরুজনদিগকে প্রণাম নমস্কার আদি চলে। আমি যখন কলিকাতার বাহিরে থাকিতাম, তখন কেহ কেহ আমার শয্যার উপরে রক্ষিত আমার ফটোখানাকেই আসিয়া প্রণাম করিয়া যাইত। তোমাদের এক বিদ্যাদিগ্‌গজ গুরুভাই হঠাৎ একদিন প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"ইহারা এভাবে আপনার ফটো প্রণাম করিবে কেন?" এই প্রশ্নটীর ভিতরেই ঐ বিদ্যাদিগ্‌গজের মনের গঠনটা লুকাইয়া ছিল।

আমি তোমাদের প্রণাম চাহি না, তবু যদি কেহ আমার প্রতিচিত্রকে প্রণাম করে, তবে তাহার আচরণের জন্য জবাবদিহি আমাকে কেন দিতে হইবে ?

এইরূপ প্রশ্ন যে কাহারও কাহারও মনে জাগে, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট সূচিত হইতেছে যে, ইহাদিগকে দীক্ষা-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দিয়া ভুল করা হইয়াছে। ইহাদের গুরুতে ভক্তি নাই, ভালবাসা নাই, অনুরাগ নাই, মাত্র নামী লোকের শিষ্য বলিয়া জনসমাজে নিজেদিগকে জাহির করিবার দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। অথচ তোমাদের মনে ভক্তি বা ভালবাসা সৃষ্টি করিবার অধ্যবসায়ে আমি মন দিতে পারি না। এর চেয়ে অনেক বড় কাজ আমার করিবার রহিয়া গিয়াছে। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ও বিব্রত।

এমন কোনও মুসলমানের কথা চিন্তা করিতে পার কি, যে "লাইলাহা ইল্লালাহ্" বলিবে কিন্তু "মুহম্মদর্ রসুল্লাল্লাহ্" মানিবে না ? আল্লাকে মানিব, মহম্মদকে গ্রাহ্য করিব না, এমন কথা কোনও মুসলমান স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। হজরত মহম্মদের প্রতি প্রাণময় ভালবাসা, হৃদয়-মন-বিজয়িনী ভক্তি এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠা মুসলমানকে জগতে দুর্জ্জয় করিয়াছে। আর তোমরা ? বড় বড় কথা কহিবে কিন্তু কোথাও তোমাদের নিষ্ঠা নাই, বিশ্বাস নাই, আস্থা নাই এবং এই জন্যই মানুষের সঙ্গে কেবল তর্কের পর তর্ক করিয়া আসর মাৎ করিবে কিন্তু যেখানে দেখিবে বিপত্তি, সেখানে প্রাণ লইয়া চোরের মতন কেবল করিবে পলায়ন।

সকলে মিলিত হইয়া সম্প্রীতি-চর্চ্চার একটী চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছিল সমবেত উপাসনাতে কিন্তু হিন্দু জাতির মজ্জাগত স্বভাব

যাইবে কোথায়? অকারণ প্রশ্ন আর নিরর্থক দ্বন্দ্ব তুলিয়া সহজ সরল সাবলীল অনুষ্ঠানগুলিকেও করিয়া তুলিবে সুদুর্গম পার্ব্বত্য অরণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথের মত দুরূহ ও দুরারোহ। ইহারই নাম হিন্দুত্ব আর ইহারই নাম শিষ্যত্ব। এইরূপ সদাদুর্ব্বল হিন্দুত্ব এবং এইরূপ অনুরাগ-বর্জ্জিত শিষ্যত্ব তোমাদিগকে কদাচ কোনও বিপদ হইতে রক্ষা করিবে না, করিতে পারে না।

সমবেত উপাসনা এমন একটা অনুষ্ঠান, যাহার সহিত প্রারম্ভে বা উপসংহারে অন্য একটা অনুষ্ঠান জুড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াই কাজটী সমাপন করিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার শান্তি-বাচন পাঠ হইয়া যাইবার পরে কেহ নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে পারিবে না, ইহা অসাত্ত্বিক জিদ্। কেহ এ প্রণামটী করিলে কেন সে নিন্দনীয় হইবে?

কাহারও মৃত্যুবাসর বা শ্রাদ্ধ-সম্পর্কিত সমবেত উপাসনায় ত (বিগ্রহ-বেদীতে নহে, পরন্তু) অন্য কোনও প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার একটী প্রতিচিত্র উৎসব-মণ্ডপের কোথাও না কোথাও রক্ষিত হয়। শোকার্ত্ত ব্যক্তিদের চিত্তপ্রসাদের দিকে তাকাইয়া ইহাতে কেহ কখনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই। অবশ্য, এই চিত্র-প্রদর্শনটী একটু মাত্রাতিরিক্ত আড়ম্বরের দাবী করিলে তাহা গ্রাহ্য হয় না। ইহাতে যদি আপত্তি না হয়, তবে তোমাদের গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে উৎসব-প্রাঙ্গণের কোথাও তাঁহার একটী প্রতিচিত্র থাকিলে বা উপাসনার অন্তে কেহ সেই প্রতিচিত্রে প্রণাম জানাইলে তোমাদের আপত্তির ফোয়ারা ফাটিয়া পড়ে কেন? ইহার পশ্চাতে প্রকৃত মানসিকতাটী কি রহিয়াছে, তাহার তোমরা অনুসন্ধান করিবে কি? আমি নিজে ত আমার জন্মোৎসব প্রবর্ত্তিত

করি নাই। দৈবাৎ মোচাগড়ায় একদা এক বিরাট উৎসব-সভায় অভিপ্রায়ের অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, অদ্যকার মঙ্গলবারটা সপ্তাহ ও মাসের দিক দিয়াও আমার জন্মদিন। ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী ছেলেমেয়েরা যে কথাটা এমন দৃঢ়তার সহিত ধরিবে, সে আশঙ্কা করিবার তখন কোনও কারণ ছিল না। তদবধি জন্মোৎসব একটা বছর বছরই হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল যে, এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সকলের মধ্যে ঐক্য ও সখ্য বাড়িবার সম্ভাবনা প্রচুর। অতএব, পরুষ কণ্ঠে নিষেধ করিয়া জন্মোৎসবকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি, এই জন্মোৎসব তোমাদের সমালোচনার সামগ্রী হইয়াছে। যিনি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের পূজা চাহেন না, তাঁহার কাজে তোমরা আপ্রাণ আত্মনিয়োগ করিবে না কিন্তু জন্মোৎসবের মণ্ডপে কোথাও তাঁহার একখানা প্রতিচিত্র থাকিবে কি না থাকিবে, তাহা নিয়া theological, metaphysical ও philosophical speculation এবং argumentationএ কোমর কাছিয়া লাগিয়া গিয়াছ। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাগুলিতে তোমাদিগকে বারংবার তাগাদা দিয়াও উপস্থিত করান যায় না, পুণ্য-ভাণ্ডারের জন্য ত্যাগ স্বীকারে তোমাদের মধ্যে হাজার-করা একজনকেও আগ্রহী দেখা যায় না, যে সহরে তোমরা সংখ্যায় পাঁচ শত জন শিষ্য আছ, সেই সহরে একটা নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইলে উক্ত অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জনকে একত্র করা মহামারী-ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্পের জন্য ডাকিলে বাহিরের লোকে সভাস্থল ভরিয়া যায় কিন্তু নিষ্ঠাবান্ সাধক বলিয়াই হয়ত তোমরা গা বাঁচাইয়া দূরে দূরে

থাক, কোথাও একটা মণ্ডলী হইলে নানা গুপ্ত ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার শান্তিভঙ্গ করিতে তোমরা লজ্জাবোধ কর না, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণের কথা কত আর বর্ণনা করিব।

মোট কথা, মিলিত হইয়া শক্তি-সঞ্চয়ের যে সুযোগ তোমরা পাইয়াছিলে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে না। বরাহ অবতারের নির্মম দংষ্ট্রাঘাত ছাড়া তোমাদের ধরিত্রীকে প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে উদ্ধার বোধ হয় কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং প্রস্তুত হও সকলে আরও বহু অত্যাচার, আরও বহু উৎপীড়ন, আরও বহু লাঞ্ছনা, আরও বহু অপমৃত্যু, আরও বহু অপমান, আরও বহু দুঃখ, আরও বহু কষ্ট সহ্য করিবার মত দীর্ঘ পরমায়ু পাইবার জন্য। তোমাদের জন্য কর্ম্মফলভাণ্ডারে এত দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে যে, একশত দুই শত বৎসরের লাঞ্ছনাতেও তাহা শোধ হইয়া যাইতে পারে না।

হজরত মহম্মদ তাঁহার ওম্মতদের ডাকিয়া পবিত্র কালেমার মধ্য দিয়া আল্লার নামটী দিয়া দিয়াছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, মহম্মদকেও সঙ্গে সঙ্গে রসুল বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে। মুসলমান মহম্মদকে ভোলে নাই এবং ভুলিবে না। তোমরাও ব্রহ্মমন্ত্র পাইয়াছ কিন্তু গুরুকে ভুলিয়া যাইবার জন্য তোমাদের কি যে আপ্রাণ প্রয়াস, কারণ গুরুদেব বলিয়াছেন,—"আমার প্রতিচিত্র সমবেত উপাসনায় পূজার বেদীতে বসাইও না, আমি সেদিন তোমাদের সমসাধক।" হিন্দু ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়া অতুল কীর্ত্তি রাখিয়াছে, সুতরাং তাহার আচরণে কেন বিশেষত্ব থাকিবে না?

পৃথিবীর সব দেশের লোকই বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি ঐহিক ও পারলৌকিক মাঙ্গল্য কার্য্য করিবার সময়ে নিজ নিজ সমাজের সুধীজন সম্মত বেশভূষা পরিধান করে। তোমরা বিবাহের দিন একটা প্যান্ট

বা লুঙ্গি পরিয়া মণ্ডপে হাজির হও নাই। ধুতি পরিয়াছিলে, চাদর গলায় ঝুলাইয়াছিলে। উপাসনার সময়েও তদ্রূপ ভাবেই বেশভূষার রীতি সাধুসম্মত। আমাদের সমবেত উপাসনায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে যোগদান করিতে আমরা অধিকার বা সুযোগ দেই বলিয়া শিখ তাহার পাগ্ড়ী, মুসলমান তাহার ফেজ, খ্রীষ্টান তাহার প্যাণ্ট নিয়া আসিয়া উপাসনার আসরে বসিয়া গেলে আমরা আপত্তি করি না, যদি সে উপাসনার মন নিয়া ও শুচি দেহে আসে। তাই বলিয়া তোমরাও সবাই প্যাণ্ট পরিয়া আসিয়া বসিয়া যাইবে, ইহা সঙ্গত কার্য্য হয় না। দেশটা বিলাত নয়, দেশটা ভারত বা বাংলাদেশ। এই দেশে উপাসনা-কালীন বেশভূষা তোমাদের দেশের সজ্জন-সম্মত হইলেই তাহা প্রশংসার। অফিসে যাইবার মুখে কেহ প্যাণ্ট পরিয়া উপাসনায় বসিল, ইহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা চলে। রবিবার ত অফিস নাই, সেই দিনও প্যাণ্ট পরিতেই হইবে কেন?

তোমার হাজার প্রশ্নের কয়টার জবাব একখানা মাত্র পত্রে দিব? অনেক প্রশ্ন করিও না। সকল প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ সদুত্তর নিজের মনের কাছেই পাইবে। সুবিনীত মনে যাহারা আমার অনুগত হইবে, সকলের সর্ব্বসংশয়-বিদূরণকারী দ্বিধা-নাশক প্রকৃত সদুত্তর তাহাদের মনে উদ্ভাসিত হইবে। যদি দেখ যে, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়া কেবল তর্কের ঝড়ই উঠিতেছে, যে যে কাজ বিনা তর্কে করা যায়, সেই সেই কাজেও সকলে সম্মিলিত হইতে আগ্রহী নহে, তাহা হইলে নীরবে নিজের সমবেত উপাসনাটী সারিয়া বিনা তর্কে ঘরে ফিরিয়া আসিও। কি লাভ হইবে নিত্য কলহের কচায়নে জীবনের মূল্যবান্ পরমায়ুর অপচয় করিয়া? যে-কাহারো নিকটে পত্র লিখিতে আমি আনন্দ পাই কিন্তু একই বিষয়ে

কত হাজার করিয়া পত্র লিখিব? আর, অকারণ পত্রই বা কে
লিখিব? ইতি—

আশীর্ব্বাদ
অরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি
৯ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮
(২৩ মে, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশি
নিও।

তোমার কন্যার বিবাহ-ব্যাপার নিয়া ভাবিত হইয়াছ। উদ্বিগ্ন হই
না। চারিদিকে চেষ্টা করিয়া যাও, ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল বর পাইয়া যাইবে
উভয় পক্ষই জাতিতে কায়স্থ কিন্তু পাত্রপক্ষ কুলীন বলিয়া তোমাদের ঘ
অপছন্দ করিয়াছে। এমন স্থানে কন্যাদান না করাই ভাল। দাম্ভিকে
ঘরে গিয়া কন্যা অসম্মানের কষ্ট সহিবে। প্রতীক্ষা কর এবং চেষ্টা ক
সময় মতন সমান ঘর পাইয়া যাইবে।

পাত্রপক্ষের গুরুদেব আবার উগ্র-জাতিভেদ-বাদী একজন প্রখ্যা
পরমহংস হওয়াতে আমি আরও কৃতনিশ্চয় হইয়াছি যে, কেবল সামাজি
সূত্রে নহে, ধর্ম্মসূত্রেও এই পরিবারে তোমার কন্যার উপরে উৎপীড়
হইবে। উগ্র-জাতিভেদ-বাদী ভদ্রলোকেরা অতি সহজে এবং বি
কারণে কখনো কখনো মন ও মেজাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া থাকে

মানুষকে ছোট ভাবা ও ঘৃণা করা একটা অপরাধ। এই অপরাধটার ইঁহারা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছেন। ইহার ফলে ইঁহাদের অবচেতন মনে একটা লজ্জা বা হীনমন্যতা সর্ব্ব সময়েই উকি-ঝুঁকি মারে। সেই হীনমন্যতাই ইঁহাদিগকে হঠাৎ ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। মুখে বলিবেন ব্রহ্মময় জগৎ কিন্তু জাতির ব্যাপারে পান হইতে চূণ খসিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশাপ সুরু হইয়া যায়। এসব শাপান্ত-বাপান্ত সাময়িক। ক্ষণকাল পরেই ইঁহারা বুঝিতে পারেন যে, কাজটা ভাল হয় নাই। কিন্তু যে মেশিনারী নিজেরা আবাল্য যত্নে চালু করিয়াছেন, তাহাকে থামাইয়া দেওয়ার সাধ্য যে ইঁহাদের নাই, তাই, ইঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহারই সমর্থনের জন্য কেবল প্রাচীন শাস্ত্রের হারাণো শ্লোকপুঞ্জ খুঁজিতে থাকেন। বর্ত্তমান জীব ও বর্ত্তমান জগতের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক নাই। তোমরা ইঁহাদের সম্পর্কে ভালমন্দ সর্ব্ববিধ সমালোচনা পরিহার করিয়া কেবল চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক যে, নিজেরা শুদ্ধ, সদাচারী, সততা-পরায়ণ, সংযমী এবং জগৎ-কল্যাণকামী কিসে থাকিতে পার। অন্যেরা যে উৎসন্নে যাইতেছে, ইহা খুঁজিয়া বাহির করার চেয়ে, তোমরা যে নিজেদের নরক নিজেরা নিবারণে চেষ্টিত রহিয়াছ, ইহার দাম অনেক বেশী।

অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব তুলিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাহটাকে একটা অনিশ্চয়তার গাছে ঝুলাইয়া রাখা উচিত নহে। কারণ, এরূপ করিতে গেলে অতীব শান্ত-স্বভাবা কন্যার মনেও অনুচিত চঞ্চলতার সৃষ্টি হইতে পারে। গুরুতর মানসিক চঞ্চলতা উপজাত হইবার পূর্ব্বেই কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যত স্থান হইতে আলাপ আসিবে, সব স্থানেই এক কথায় রাজি হওয়া সম্ভব

নহে কিন্তু একটা আলাপ কোথাও হইতে আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যোগাযোগ করিবার জন্য তৎপর হওয়া ভাল। উদ্দেশ্য, একস্থানে কথাবার্ত্তায় না পটিলে সঙ্গে সঙ্গেই অন্য স্থানে শেষ কথা বলিয়া ফেলা যাইবে। বিবাহের ব্যাপারে কথা দিয়া বা পাকা দেখিয়া বা পাটিপত্র করিয়া তৎপরে বিবাহ ফিরাইয়া দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়ার মত মনঃকষ্টকর ব্যাপার আর কিছু নাই। সুতরাং শেষ সম্মতিটি দিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া দিতে হইবে, সকল বিষয়ে ভাল করিয়া খোঁজ খবর নিয়া লইতে হইবে। তৎপরতা দরকার কিন্তু তাড়াহুড়া ভাল নহে।

আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন, যে দিকে সাধারণ বাপ-মায়ের দৃষ্টি দিতে খুব কমই দেখা যায়। সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ পাত্রেই তোমরা কন্যাদানের চেষ্টা করিবে, ইহা ত জানা কথা। তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকিলে তোমরা কোনও লোভনীয় পাত্রকেই ছাড়িয়া দিবে না, ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু কার ঘরে যে কে পড়িবে, তাহা একমাত্র বিধাতা ব্যতীত আর কেহ জানেন না। এই ব্যাপারে একটা অসাধারণ অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। যাহাকে সোণার ছেলে মনে করিয়াছ, হয়ত পরে দেখা যাইবে যে, তার দাম একটুকরা ঘুঁটের চেয়েও কম। যে পরিবারকে স্বর্গের নন্দন মনে করিয়াছ, তাহা হয়ত নরকের চেয়েও ঘৃণ্য। যাহাকে বিড়লাদের মত ধনী মনে করিয়াছ, তাহারা হয়ত ফুটপাথের ফেরিওয়ালার মত ভিতরের অবস্থা। মরীচিকা দেখিয়া অনেক সময়ে প্রকৃত আলো জ্ঞান করা হয় এবং পরে মায়া-মরীচিকা ধরা পড়িয়া গেলে আর আফশোষের অবধি থাকে না। এই সব অপ্রত্যাশিত এবং দুঃখকর বিস্ময় অনেকের জন্য জমা থাকে, যাহা শত অনুসন্ধান করিয়াও আগে জানা যায় না। আশীর্ব্বাদ করি, প্রত্যেকের কন্যা

সুখী হউক, কিন্তু যে-কোনও অবস্থায় পড়িয়া কন্যা যাহাতে ঘাবড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য তাহাকে মনের দিক দিয়া, চরিত্রের দিক দিয়া, সঙ্কল্পের দিক দিয়া তৈরী হইতে হইবে। এই আত্ম-প্রস্তুতি সমগ্র জীবন তাহার কাজে আসিবে।

একদিকে যেমন কন্যার জন্য পাত্র খুঁজিতেছ, অন্য দিকে তেমন তাহাকে অবিরাম শিক্ষা দিয়া যাইতে হইবে যে, যেমন সংসারেই ভগবানের ইচ্ছায় সে গিয়া পড়ুক না কেন, তাহাকে একটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-বিগ্রহের মত পূর্ণতার এক দীপ্তি নিয়া সেই সংসার আলোকিত করিতে হইবে। লক্ষ্মী পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নাবিধৌত স্নিগ্ধ রজনীর দেবী। লক্ষ্মী শান্তিদাত্রী, দুশ্চিন্তাবিনাশিনী ও সর্ব্বজনসমাদৃতা। ঠিক এই গুণগুলি পতিগৃহে গিয়া তাহাকে প্রকট করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা, স্নেহ-পরায়ণতা, সেবাবুদ্ধি, এবং সদা-সন্তুষ্ট ভাব নিয়া তাহাকে পতির সংসারটী জয় করিতে হইবে। বিবাহিত জীবন যাহার পক্ষে এক অনাস্বাদিত জগৎ, তাহার মনের মধ্যে নিয়ত উৎফুল্লতা-বিধায়ক এই সকল উচ্চ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে তাহার নবজীবনের পথের যোগ্যতা প্রদান করিতে হইবে। একটু মুখের হাসি, একটু স্নেহের অবদান, একটু উচ্চচিন্তার উচ্ছলতা দিয়া তাহাকে নূতন জীবন-যাত্রার জন্য যোগ্য ভাবে তৈরী করিয়া দিতে হইবে। হাজার হাজার পুস্তক পাঠের চেয়েও এই শিক্ষাটুকু লাভ করা তাহার পক্ষে শতগুণ লাভজনক বলিয়া তার নিজ জীবনেই প্রমাণিত হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে কেহ অবহেলা করিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কাঁকুরগাছি
৯ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়াছি। যাহা যেরূপ চাহিয়াছ, সেই বিষয়ে তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে জানিও।

আমার আশীর্ব্বাদ অকপট ও নিঃস্বার্থ। আমার ভালবাসায় খাদ নাই, ভেজাল নাই। বিনা কারণেই আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভালবাসি। অনেকে অনেককে কারণ থাকিবার দরুণ ভালবাসে। আমার ভালবাসার কোনও কারণ বা অকারণ নাই। ভালবাসা আমার স্বভাব বলিয়াই আমি ভালবাসি। এই জন্য ভালবাসার প্রতিদানে কাহারও কাছে কিছু চাহি না বা প্রত্যাশা করি না।

পুপুন্কীতে এবার আমি এক মাসে দশ হাজার টাকার মাটি কাটাইব, এইরূপ কল্পনা ছিল। বাঁকুড়া জেলা হইতে যদি মাটি কাটিবার লোকগুলি আসিয়া যাইত, তাহা হইলে অন্য কোনও অসুবিধার জন্য এই কাজ বন্ধ রাখিতাম না। এক সময়ে আলিপুরদুয়ার হইতে দুইখানা নৌকা তৈরী করাইয়া ট্রেণ-যোগে ধানবাদ এবং ট্রাক-যোগে পুপুন্কী আনা হইয়াছিল। সে আজ প্রায় দশ বৎসর আগের কথা। তার দুই বৎসর পরেই কালনার ওপারে নদীয়া জেলার শ্রীমান্ রামানন্দ বর্ম্মণের উদ্যোগে ভাল মিস্ত্রী আনাইয়া পুপুন্কী আশ্রমে বসাইয়াই আরও দুইখানা নৌকা তৈরী করান হয়। এতকাল নৌকা কয়খানা মঙ্গলসাগরের এক তীর হইতে অন্য তীরে মাল ও মাটি বহনের কাজে লাগান হইয়াছে। এবার নৌকা কয়খানার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করিবার আশা ছিল। প্রথম

দুইখানা নৌকাতে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলীর আংশিক সহায়তা ও নির্ম্মাণ-কালে পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছিল। এই প্রসঙ্গে আজ স্বর্গীয় রাজেন্দ্র কুমার বক্শীকে বারংবার মনে পড়িতেছে। কি অদম্য-সেবা-প্রাণ কর্ম্মী যে সে ছিল, যাহার জুড়ী আর আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখিলাম না। কর্ম্মী যদি নিরভিমান ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সে বড় কর্ম্মী হউক আর ছোট কর্ম্মী হউক, তাহাকে জগতে কেহ কদাপি ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

এবার যদি দশ হাজার টাকার মাটি মঙ্গলসাগরের এপার-ওপার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার চারিখানা নৌকার সম্পূর্ণ মূল্য সুদে-আসলে উঠিয়া যাইত। অনেক কাল পরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি অনেক কাল পরের বহু কাজ অল্পে-অল্পে করিয়া রাখিতেছি। আট বা দশ বৎসর আগেই নৌকা গড়িবার সঠিক প্রয়োজনীয়তাটা তোমরা যদি কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া থাক, তবে তোমাদের আমি দোষ দিতে পারি না। আমার সব-কিছুই যদি তোমরা এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিবে, তবে ত আমি তোমাদের বাবামণি না হইয়া তোমরাই আমার বাবামণি হইতে!

কিন্তু এবার আর আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। বাঁকুড়া হইতে মাটিকাটার লোক আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। আমিও শারীরিক কারণে সময়মত পুপুন্কী যাইতে পারিলাম না। তবে, শ্রমজীবীরা আসিয়া গেলে কাজটা বুঝাইয়া দিবার জন্য হইলেও একবার যাইতাম। এই বর্ষাটা আমাদের বোধ হয় বৃথাই যাইবে।

সভা, সম্মেলন, উৎসব প্রভৃতি কাজের শেষ নহে, কাজের সূচনা মাত্র। সম্মেলনে যাহা যাহা আলোচিত বা গৃহীত হইবে, জেলা বা

প্রদেশ জুড়িয়া তাহার রূপায়ণের জন্য অবিরাম চেষ্টা চলা চাই। তবেই সম্মেলন সার্থক। সম্মেলনে চমৎকার একটা বক্তৃতা দিয়া তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এখন তোমার প্রয়োজন হইতেছে একজন হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞের কাছ হইতে হৃচ্ছক্তিসঞ্চারিণী বটিকা গ্রহণ করিয়া শয্যাশ্রয় লওয়া,—এইটাই একটা বড় রকমের কৃতিত্ব নহে। যাহা বলিয়াছ, কহিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ এবং সমর্থন করিয়াছ, তাহাকে কার্য্যে রূপ দিবার জন্য সর্ব্বশক্তি পণ ও সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ মনোভাবের সঞ্চারণ যদি সকলের বা অধিকাংশের মধ্যে করিতে পারিয়া থাক, তবেই তোমাদের সভা, সম্মেলন ও উৎসব প্রভৃতি সফল হইয়াছে, বলিতে হইবে। নানা জেলার কয়েকটী স্থান হইতেই সভা, সম্মেলন ও উৎসবাদির কার্য্য-বিবরণ পাইয়াছি এবং পাঠ করিয়া তোমাদের উৎসাহের পরিচয় পাইয়া সুখানুভব করিতেছি।

কিন্তু কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্তরের অকপট আনুগত্য না থাকিলে সে কাজ কেহ করিতে পারে না। কোথায় তোমাদের অন্তরের অকপট আনুগত্য, কোথায় তোমাদের দ্বিধাহীন অভিমান-বিসর্জ্জন, কোথায় তোমাদের উদ্ধত অহমিকার অবসান,—সেই স্থানটী সকলেই খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। সেই স্থানটী যদি ঠিক ঠিক চিনিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের দুর্দ্দম কর্ম্মশক্তি বৃথা পথে প্রবাহিত হইয়া অপব্যয়িত এবং অপচয়িত হইবে। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাহাদের সকলের নিঃসর্ত্ত আত্ম-সমর্পণ নাই, তাহাদের মধ্যে বৃহৎ ও মহৎ কর্ম্মের ব্যাপারে পারস্পরিক সৌভ্রাত্র্য, মিত্রতা, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সুদূর-পরাহত হইয়া থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা
৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইলাম। দুই বৎসরের কয়েক দিন আগে ইংরাজি ৭১ সালের ৫ই মে তারিখে তোমাকে যে পত্র দিয়াছিলাম এবং যাহা তুমি পাও নাই বলিয়া লিখিয়াছ, তাহার অনুলিপি নিম্নে দিতেছি।

"সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ জুড়িয়া যে মরণোৎসব চলিয়াছে, তাহার কিছু খবর আমাদের নিকটে আসিয়া নিশ্চয়ই পৌছিতেছে। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা ও অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা আমাদের মনকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই নারকীয় উল্লাস থামিয়া যাউক, দেশ জুড়িয়া শান্তি ফিরিয়া আসুক, সেই শান্তি আসুক, যাহা মনুষ্যজাতির পক্ষে গৌরবের এবং ইতিহাসের কলঙ্কমোচক।

"তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার ন্যায় আরও বহু জনেরই পত্র পাইতেছি। একটী জিনিষ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেছি যে, তোমরা নিজের পুত্র, নিজের কন্যা, নিজের পত্নী, নিজের আত্মীয় ছাড়া আর কাহারও কথা ভাবিতেছ না। যে বিপদে তোমরা পড়িয়াছ, তাহা একজনের একটা বিচ্ছিন্ন বিপদ নহে, সহস্র সহস্র জনকে, লক্ষ লক্ষ জনকে একই পদ্ধতিবদ্ধ সুশৃঙ্খল বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তোমরা সবগুলি বিপন্ন মানুষের কথা

এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতেছ না। অন্ততঃ এই কয়দিনে যে কয়েক কুড়ি পত্র আমার নিকটে এই বিষয়ে সদ্যোবিপন্নক্ত (অর্থাৎ ভারতে শরণার্থী) লোকদের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহার একখানাতেও নিজের আত্মীয়-পরিজনের বাহিরে অন্যদের জন্য একটী লোককেও চিন্তা করিতে দেখিলাম না। মানুষগুলি এত স্বার্থপর হইবে বলিয়াই কি একদা আমি তাহাদিগকে জগন্মঙ্গলের দীক্ষা দান করিয়াছিলাম? সকলকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা যতকাল তোমাদের না হইবে, ততকাল তোমাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোনও অধিকার নাই।

"তোমরা একটী দুইটী আত্মীয়-স্বজনের জন্য চিন্তা না করিয়া সমগ্র দেশের প্রত্যেকটী প্রাণীর জন্য চিন্তা কর এবং কাতর ভাবে শ্রীভগবচ্চরণে কাম্য ও প্রকৃত শান্তির জন্য প্রার্থনা কর। আমার সন্তানের দৃষ্টি কেবল নিজ আত্মীয় পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে কেন? আমি যে তোমাদের জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের দাতা!"

দুইটা বৎসরের মধ্যে ইতিহাস এবং ভূগোলের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তথাপি সেদিনকার লেখা কথাগুলি তোমাদের প্রত্তিজনের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে হয়ত তোমাদের অনেক আশাই এখনো সফল হইবার পথে আসে নাই, কিন্তু তোমরা চঞ্চল হইও না। যেখানে যতদিন থাকার মানুষের মতন থাক এবং পৃথিবীতে যতদিন বাঁচার মানুষের মত বাঁচ। মানুষের মত থাকিতে হইলে বিশ্ববাসী সকলকে আপনার ভাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

একে অন্যকে আপদে-বিপদে সহায়তা করিও। দুর্য্যোগে পীড়িত ভাই-বোন্‌দিগকে সাহায্য-সহায়তা করিতে অকুণ্ঠ থাকিও। হিংসা-বিদ্বেষের হলাহল পান করা হইতে দূরে থাকিও। সর্ব্বজীবের প্রতি ভালবাসা, সর্ব্বজনের প্রতি মৈত্রীভাব কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সেই দিকে নজর রাখিবে। ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা বা রুদ্ধ আক্রোশ মানুষকে অনেক সময়ে বিপথে পরিচালিত করে। ভগবচ্চরণে অবিরাম প্রার্থনা করিবে, হে ভগবান্, অন্তরে আমার প্রেম দাও, বিশ্ববাসী প্রতিজনকে প্রেমধনে ধনী কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমাদের সকলের পত্রই পাইয়াছি। জনে জনে আলাদা উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। একজনের পত্র হইতেই দশ জনে উপদেশ আহরণ করিও।

একের নিকটে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী, সহচারী, সমপন্থী বা সমসাধক ব্যক্তিরা কেন সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিয়া দেখিবে না যে, এই মুহূর্ত্তে তাহাদেরও কিছু না কিছু করণীয় নিশ্চয়ই রহিয়াছে? একের নিকটে প্রেরিত প্রেরণা যখন অন্য সকলকে আবেশিত

করে না, তখন বুঝিতে হইবে, ইহারা সমমতের মতী হইলেও ইহাদে মধ্যে ঐক্য-বন্ধন বা প্রীতি-সম্বন্ধ দৃঢ় হয় নাই। একের নিকটে একটী বাক্য, তত্ত্ব বা নির্দ্দেশ বিচ্ছুরিত হইলে তাহাকে দামী মনে করিয়া অন্যান্য সমভাবের ভাবুকদের মধ্যে অচিরে তাহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার যে অনুশীলন, তাহা সঙ্ঘকে নববলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারে। ইহার বিপরীত আচরণ সংঘের ঐক্য, মহত্ত্ব ও শক্তি হ্রাস করিয়া দিতে পারে। তোমাদের অনেকের ব্যক্তিগত পত্রের উত্তর যে "প্রতিধ্বনি"তে মুদ্রিত হয়, তাহার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে প্রতি জনে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় উপদেশ সংগ্রহ করিয়া নিবে। কোনো কোনো স্থানে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

নেতা হইবার চেষ্টা না করিয়া যদি তোমরা সকলের ভাই হইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে, ইহার ফলে কত নগণ্য ব্যক্তিদের দ্বারা কত সুধন্য ও সুগণ্য কাজ করান সম্ভব হয়। নেতার অভাব কোথায় যে তোমাকেও নেতাই হইতে হইবে! সেবকেরই ত অভাব। তোমরা সেবক হইবার আগ্রহ কেন অন্তরে অনুভব করিতেছ না? আমি সেবকদেরই চাহি, নেতাদের নহে।

ভৌগোলিক ভাবে যে সকল "মণ্ডলী" পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা সহজেই ফলপ্রসূ হয়। কঠিন হইতেছে, সন্নিকটস্থ মণ্ডলীগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের বা যোগ-বিয়োগের সম্পর্কগুলিকে মধুর রাখা। অথচ সম্পর্ককে সন্দেহাতীত রূপে প্রীতিসিক্ত রাখিতে পারিলেই মণ্ডলীগুলির মধ্যে সঙ্ঘশক্তি ব্যাপক মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। সন্নিকটবর্ত্তী

স্থানগুলিতে প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলির ভিতরে পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক এবং ব্যবহারিক আচরণ যাহাতে অনুগ্র, মধুর, প্রীতিপূর্ণ ও হৃদ্যতাসিক্ত থাকে, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি তোমাদের রাখিতে হইবে। নেতৃত্বের অহমিকা হইতে মনকে মুক্ত করিতে না পারিলে এ কাজে তোমরা সফলকাম হইবে না। নেতাগিরিকে তিন লাথি মারিয়া খর্ব্ব করিয়া দাও, প্রত্যেকে প্রাণপণে সেবক হও।

অতীতের ক্ষুদ্রতর সাফল্যকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর সাফল্যে ও সার্থকতায় নিয়া যাইবার জন্যই তোমাদিগকে এখন কাজ করিতে হইবে। একাজ উপেক্ষণীয় নয়। যেখানে একদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সফলতা আহরণ করিয়াছ, সেই স্থানকে তীর্থভূমি বলিয়া সম্মান দিবে, সেখানকার কর্ম্মীদের প্রতি সম্ভ্রমসূচক সদ্ব্যবহার করিবে, সেখানকার পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচীগুলিকে অধিকতর সফলতা দিবার জন্য সকলে মিলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। আমি তোমাদিগকে শাশ্বত কালের পথ চলিবার জন্য নির্ভুল নীতির নির্দ্দেশ দিতেছি। শ্রদ্ধা-সহকারে আমার প্রতিটি বাক্য পালন কর।

মণ্ডলীর কাজ যাহাতে বিনা কলহে, বিনা বিতর্কে, বিনা দ্বন্দ্বযুদ্ধে চালান যায়, সেই দিকে সকলে দৃষ্টি দাও। নতুবা এই সব মণ্ডলী অচিরকালমধ্যে ধূলায় লুটাইয়া যাইবে। মণ্ডলীকে কাহারও ব্যক্তিগত ব্যবসায় বৃদ্ধির উপায় রূপে ব্যবহৃত হইতে দিও না। মণ্ডলীর আশ্রয় নিয়া সেবকের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া কেহ লোকপ্রবঞ্চনা করিবার সুযোগ না পায়, এই বিষয়ে সতর্ক থাকিও।

মণ্ডলী একটী সমষ্টীভূত বস্তু। তার কাজ একা একা কি করিয়া করিবে, বুঝিলাম না। একা একা কাজ করিলে অহঙ্কারের পূজা হয়, মণ্ডলীর সেবা হয় না। ছোট কাজ, বড় কাজ, সব কাজই সকলকে লইয়া

করিবার চেষ্টা করিবে। বড়কে ডাকিবে তাহার সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইবার জন্য, ছোটকে ডাকিবে তাহার অকপট অক্লান্ত শ্রমটুকু পাইবার জন্য, ছোটবড় সকলকে ডাকিবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সস্নেহভাব অনুশীলনের সুযোগ দিবার জন্য। এগুলি সবই লাভের অঙ্ক। ইহাতে ক্ষতি কিছুই নাই।

সকলের সীমাহীন আগ্রহের মধ্য দিয়া যেই মণ্ডলীর জন্ম, সকলের অতুলন একপ্রাণতার মধ্য দিয়া যে মণ্ডলীর কর্ম্ম, সকলের দ্বিধাহীন নিষ্ঠার মধ্য দিয়া যে মণ্ডলীর বিকাশ ও বিস্তার, সেই মণ্ডলী বিশ্বের সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে। আর, সবগুলি মণ্ডলীর আনুগত্য যদি একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে, তাহা হইলে তোমাদের মিলন-ফলে এমন অনেক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে, যাহার ফল নিখিল ভুবনের প্রতিজনের নিঃশ্রেয়স কুশল। বারংবার বলি, এ কথাটী তোমরা ভুলিয়া যাইও না।

জাতিতে জাতিতে রেষারেষি, সমাজে সমাজে বিভেদ-কলহ, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ধারাবাহিক হিংসা ও প্রতিহিংসার স্থান প্রকৃত মণ্ডলীতে নাই। তোমরা মণ্ডলীগুলির পরিবেশ সর্ব্বপ্রকার দ্বেষ হইতে মুক্ত রাখ, সর্ব্বপ্রকার দর্প, দম্ভ, অহমিকার প্রবেশাধিকার হইতে শুদ্ধ রাখ, সর্ব্বপ্রকার আক্রোশ, আস্ফালন ও ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের বাহিরে রাখ।

ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিদের ভিতরেও যদি মিলন-বস্তুটী ভাণ মাত্র না হয়, ইহা যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে এই সকল একদা-ক্ষুদ্র একদা-তুচ্ছ ব্যক্তিরা জগতে অনেক অঘটন ঘটাইয়া দিতে পারে। মণ্ডলীগুলি তাহাই সপ্রমাণ করুক।

মণ্ডলীগুলির ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে একটী বিশেষ ব্যাপারে সর্ব্বসম্মত হইতে হইবে। আমি যাহাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি বা করিয়া দিব, তোমরা তাহার নেতৃত্ব কদাচ অস্বীকার করিও না। এইটী আমার উপদেশ নহে, এইটী আমার আদেশ। অবাধ্যতার অভ্যাস একবার যাহাদের মধ্যে আসে, তাহারা বারংবার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে এবং সবচেয়ে দামী আদেশকে হেলায় লঙ্ঘন করে। শিষ্য নামে পরিচয় দিবার পরে কেহ আমার অবাধ্য হইও না। কারণ, উহা সর্ব্বনাশের পথ। তোমরা আমার শিষ্য নহ, একথাটী তোমাদের নিজ মুখে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশের পরে অবাধ্য হইও। তোমাদের কলহপ্রিয়তা যে ভাবে তোমাদিগকে কেবলই নীচে টানিয়া নিতেছে, তাহাতে আমার লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, আতঙ্কও হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(ত্রিংশতম খণ্ড সমাপ্ত)